জগতে আমরা কোথায় ?

আমাদের গতি বা অবস্থান কোথায়, তা আমাদের চেতনা, মনোভাব ও প্রস্তুতির উপর নির্ধারিত হয়

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জগতে আমরা কোথায়?

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীসনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Jagate Amra Kothay (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীবসন্ত পঞ্চমী ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, ৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত,, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীলঘুভাগবতামৃত শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক জগৎ সৃষ্টির কথা; ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাইরের গ্রহলোকাদির কথা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ভগবানের ছয় প্রকারের অবতার, জীব, তার চেতনা, তার কর্ম ও কর্মফল, নরকের কথা, ভগবদ্ধামের কথা, জীবের অবস্থান ও তার গতিবিধির কথা প্রভৃতি রয়েছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ কৌতূহলী হয়ে অবশ্যই জানতে চাইবেন 'জগতে আমরা কোথায়?'

অনিত্য জগতের জড় রূপ-রসে মোহিত হয়ে আমরা থাকতে পারি এই ভুবনে কিংবা অন্য ভুবনে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কিংবা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে। কিংবা, সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠজগতের কোন লোকে, কিংবা সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবনে আমরা থাকতে পারি। আমাদের মনোভাব ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করছে আমাদের গতি কোথায়? 'জগতে আমরা কোথায়?' এই গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠকচিত্তে বৈকুণ্ঠকর্ম তথা ভগবৎ ভক্তিমূলক বৃত্তিতে নিবিষ্ট হতে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাবে আশা করি।

জগতে আমরা কোথায়?

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ গ্রহ রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন সমগ্র মহাজগতের চারভাগের তিনভাগই চিৎ বৈকুণ্ঠ-জগৎ আর বাকী এক ভাগ জড় ব্রহ্মাণ্ড-জগৎ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব—এই সপ্ত মহাআবরণ দিয়ে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শ্রীভগবান সূর্যকে স্থাপন করেছেন। সূর্যদেব সর্বত্র আলোক ও তাপ বিকিরণ করছেন। ব্রহ্মাণ্ডটি একটি বিশাল গোলক। ব্রহ্ম—বিশাল, অণ্ড—ডিম্ব। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে সূর্যদেব অবস্থিত। সূর্য এবং অণ্ডগোলকের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বের পরিমাণ পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন অর্থাৎ ৩০০ কোটি কিলোমিটার। সূর্যমণ্ডল থেকে ১ লক্ষ যোজন ব্যবধানে অর্থাৎ ১২ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রগ্রহ অবস্থিত। চন্দ্রদেব আমাদের স্নিগ্ধকিরণ প্রদান করছেন। চন্দ্রমণ্ডলের ১ লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে। সেই নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ২ লক্ষ যোজন অর্থাৎ ২৪ লক্ষ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে বুধ গ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহ প্রাণীদের কখনও মঙ্গলপ্রদ আবার কখনও অমঙ্গলপ্রদ। বুধ গ্রহ থেকে সম দূরত্বে অর্থাৎ ২ লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে শুক্রগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহ সর্বদা প্রাণীদের শুভদৃষ্টি দান করে। শুক্রগ্রহের ২ লক্ষ যোজন অর্থাৎ ২৪ লক্ষ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে মঙ্গল গ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহ প্রাণীদের মঙ্গলপ্রদ নয়। মঙ্গলগ্রহের ২ লক্ষ যোজন বা ২৪ লক্ষ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহ প্রায়ই পরমার্থীগণের অনুকূল হন। বৃহস্পতি গ্রহের ২ লক্ষ যোজন উপরে শনৈশ্চর বা শনিগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহ সর্বদা অশুভপ্রদ। শনিগ্রহের ১২ লক্ষ কিলোমিটার উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। এই মণ্ডল সর্বদা লোকের মঙ্গল চিন্তা করতে করতে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১ লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে ধ্রুবলোক অবস্থিত। এখানে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ, ধর্ম প্রমুখ কর্তৃক সম্মানিত ধ্রুব মহারাজ অবস্থান করছেন। এই ধ্রুব উত্তানপাদের পুত্র যিনি ব্রজের মধুবনে নারদমুনির নির্দেশে সত্যযুগে তপস্যা করে ভগবান শ্রীহরির দর্শন লাভ করেছিলেন।

ভৃগুমুনিদের লোক মহর্লোক থেকে ধ্রুবলোকের দূরত্ব ১ কোটি যোজন অর্থাৎ ১২ কোটি কিলোমিটার। মহর্লোক থেকে চতুষ্কুমারদের লোক জনলোকের দূরত্বও ১ কোটি যোজন। জনলোক থেকে ৮ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ৯৬ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে তপোলোক। বৈরাজ দেবগণের বাসস্থান। তপোলোক থেকে ৪ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ৪৮ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে সত্যলোক অবস্থিত। ব্রহ্মার স্থান।

ধ্রুবলোক থেকে সূর্যের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১৪ নিযুত যোজন অর্থাৎ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্যের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১ লক্ষ যোজন অর্থাৎ ১২ লক্ষ কিলোমিটার।

ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক—এই তিন লোককে 'কৃতক' বলা হয়। জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই তিন লোককে 'অকৃতক' বলা হয়। মহর্লোক অর্থাৎ কৃতক ও অকৃতকের মধ্যবর্তী লোককে 'কৃতাকৃতক' বলা হয়। কৃতক প্রতি কল্পে সৃষ্টি হয় ও ধ্বংস হয়। অকৃতক প্রতি কল্পে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় না। কৃতাকৃতক কল্প শেষে জ্ঞানশূন্য হয়, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না।

সূর্যমণ্ডলের ১০ হাজার যোজন নিম্নে রাহুগ্রহ অবস্থিত। সূর্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুর অবস্থিতিকে 'গ্রহণ' বলা হয়। রাহু গ্রহ অশুভ সৃষ্টি করে। রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন অর্থাৎ ৮০ হাজার মাইল নীচে সিদ্ধ-চারণ-বিদ্যাধরগণের বাসস্থান। সেই সব স্থানের অধোদেশে যক্ষ-রাক্ষস-ভূত প্রভৃতির স্থান ভুবর্লোক। ভুবর্লোকের ১০০ যোজন অর্থাৎ ১২০০ কিলোমিটার নীচে ভূলোক বা পৃথিবী, যেখানে আমরা বাস করছি। পৃথিবীর নীচে রয়েছে সপ্ত পাতাল লোক। প্রতি ১০ হাজার যোজন অন্তর যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল গ্রহলোক অবস্থিত। পৃথিবী থেকে পাতাল লোকের দূরত্ব ৭০ হাজার যোজন।

অতলে ময়দানবের পুত্র বল অবস্থান করছেন। তাঁর জৃম্ভন (মুখের হাই) থেকেই স্বৈরিনী, কামিনী ও পুংশ্চলী এই তিন প্রকারের নারীর উৎপত্তি হয়। অতলের নীচে বিতল। সেখানে হরগৌরীর আবাস। তাঁদের দ্বারা 'হাটক' নামক স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের নীচে সুতল। সেখানে বলি মহারাজ আছেন। তিনি প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি। মহা ধর্মপ্রাণ। ভগবান বামন অবতার তাঁর কাছে ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষার ছলে সারা ব্রহ্মাণ্ড দুই পাদেই অধিকার করেছিলেন। বাকী এক পাদ কোথায় রাখবেন তখন বলি মহারাজ নিজের মাথা পেতে দিয়েছিলেন। এই আত্মনিবেদনের জন্য স্বর্গলোকের চেয়েও উন্নত গ্রহলোক সুতলে বলি মহারাজকে অধিপতি করে স্বয়ং ভগবান তাঁর দ্বারীরূপে সেখানে অবস্থান করছেন। মহাপরাক্রমশালী রাবণ একবার সেখানে হানা দিয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী বামনদেবের চরণের বুড়ো আঙুলের আঘাতে রাবণ আশি হাজার মাইল দূরে ছিটকে পড়েছিলেন বলে বর্ণনা রয়েছে।

সুতলের নীচে তলাতল। এখানে ময়দানব থাকেন। এই ময়দানব ভারতের ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর রাজপুরী বানিয়ে দিয়েছিলেন। মহান শিল্পী তিনি। সেই পুরী দর্শনে এসে দুর্যোধনের মতিভ্রম হয়।

তলাতলের নীচে মহাতল। এখানে অসংখ্য গর্তময় স্থান। সেই গর্তে দৈত্য ও দানবদের বাস। মহাতলের নিচে রসাতল। এখানে বহু ফণাযুক্ত জ্যোতির্ময় মণি সম্পন্ন সর্পদের বাসস্থান। তাদের মাথার জ্যোতিতেই গ্রহলোক আলোকিত। সূর্যের আলো নিম্ন লোকগুলিতে প্রবিষ্ট হয় না। ওরা খুবই সুখে থাকে। কাউকেই ভয় করে না, কিন্তু গরুড়দেবকে শুধু ভয় করে থাকে। পাতাললোকে বাসুকীরাজ বাস করেন। দেবতা ও দৈত্যগণ এই বাসুকীনাগকে ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের রজ্জুরূপে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পাতাল লোক থেকে ৩০ হাজার যোজন নীচে অনন্ত ধাম। অনন্তদেব অহংকারের অধিষ্ঠাতা। ভগবান সংকর্ষণের

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি জড় ও চেতনজগতের সব কিছুর উৎস। সমস্ত কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত। সেই তত্ত্বটি জেনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।" (গীতা ১০/৮)

(১) অহং সর্বস্য প্রভবঃ—সমস্ত সৃষ্টির উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

(২) মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—যা কিছু ঘটে চলেছে তা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই প্রবর্তিত।

(৩) ইতি মত্বা ভজন্তে মাং—যে এটি জানতে পারবে সে অবশ্যই কৃষ্ণভজনা শুরু করে দেবে।

(৪) বুধা ভাবসমন্বিতাঃ—বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই শুদ্ধভক্তি সহকারে সর্বকারণের পরমকারণ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে। মুর্খেরা কেবল জল্পনা-কল্পনা করবে আর ভাবতে থাকবে সবই কৃষ্ণ করাচ্ছেন, সব দোষ কৃষ্ণের আর আমি নির্দোষ। এই ভেবে তারা কৃষ্ণভজন এড়িয়ে চলতে থাকবে। ভগবান আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, তাই আমরা বুদ্ধিমান প্রাণী। তিনি দিয়েছেন ইচ্ছাশক্তি। নিজ ইচ্ছায় চলার স্বতন্ত্রতা রয়েছে। ভগবান কাউকে বাধ্য করিয়ে বা যন্ত্রের মতো করে রাখেননি। প্রত্যেকে নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করে ভাল বা মন্দ ফল ভোগ করছে। কিন্তু যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাবসমন্বিতা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সহকারে কৃষ্ণভজনা করেন।

ঋকবেদে বলা হয়েছে—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
কৃষ্ণ হা উ কর্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্বৈঃ কার্যঃ ॥
কৃষ্ণঃ কাশং কৃদাদিশোমুখপ্রভুঃ পূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্‌-
জাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন সচ্চিদানন্দঘন, তিনি হলেন আদি পরমপুরুষ। কৃষ্ণই সমস্ত কার্যের মূল এবং সকলের মধ্যে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণেরও আরাধ্য ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ হলেন অনাদি। এই বিশ্বের অভ্যন্তরে বা বাইরে যা কিছু মঙ্গলময় বলে দেখা যায় সেই সবই ভক্ত শুধু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই পেয়ে থাকেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩৩) পরমেশ্বর ভগবানের উক্তি উল্লেখিত রয়েছে—ব্রহ্মাকে ভগবান বলছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

"সৃষ্টির পূর্বে আমিই একমাত্র ছিলাম। আমি ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, একাংশেন স্থিতো জগৎ। এই জড় ব্রহ্মাণ্ড জগৎ হচ্ছে এক-চতুর্থাংশ, চিন্ময় বৈকুণ্ঠ জগৎ হচ্ছে অবশিষ্ট তিনভাগ আয়তনের। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এবং বৈকুণ্ঠগ্রহও অসংখ্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠ জগৎটি বিশাল এবং ব্রহ্মাণ্ড জগৎ তার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। এই জড় জগতে অসংখ্য সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমন্বিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সৃষ্টির অধিকাংশই রয়েছে চিন্ময় আকাশে।

অবতার। তিনি অনন্তমুখে অনন্তকাল ধরে শ্রীহরির অনন্ত মহিমা কীর্তন করে চলেছেন। রাজা চিত্রকেতু অনন্তদেবের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার প্রথম চারপুত্র সেখানে হরিকথা শ্রবণ করতে গিয়েছিলেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মুনিঋষিগণ অনন্তদেবের সঙ্গে আলাপাদি করে থাকেন।

দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করেও প্রাণীরা বৈকুণ্ঠ জগতে যাওয়ার চেষ্টা-হীনতা দেখলে শ্রীঅনন্তদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ভ্রূ থেকে একাদশ রুদ্র সৃষ্টি করেন। সেই রুদ্রদের দ্বারা ত্রিলোক ধ্বংস করেন।

পৃথিবীতে ধর্মপরায়ণ, কামী, কর্মী ও গৃহস্থগণ ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে গমনাগমন করেন। নিষ্ঠাপর নিষ্কাম, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও তাপসগণ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকে গমন করেন। পৃথিবী থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বদিকে ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক অবস্থিত। সত্যলোকে শ্রীব্রহ্মার আবাস। ব্রহ্মার একদিনের মধ্যেই স্বর্গলোক অবধি প্রলয় হয়ে যায়। পরদিন আবার সৃষ্টি শুরু হয়।

মর্ত্যলোকে ভগবানের লীলাবিলাসের মধ্যে যে সব ভগবদ্ বিরোধী অসুরেরা শ্রীহরির হস্তে নিহত হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে বিরজার ওপারে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধামে গমন করেন। সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি। ভগবানের জ্যোতিতে তাঁরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে থাকেন।

ব্রহ্মজ্যোতি স্তরের ঊর্ধ্বে রয়েছে অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধাম। সেখানে পরম ঐশ্বর্যপ্রিয় ভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপর ভক্ত, প্রেমাতুর ভক্তরা গমন করেন। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ থাকেন। সবাইকে দেখতে লক্ষ্মী ও নারায়ণের মতো অপূর্ব সৌন্দর্যময়। সেই নারায়ণ-ধামের ঊর্ধ্বে শ্রীগোলোক ধাম অবস্থিত। যাঁরা ব্রজের আনুগত্যে শ্রীহরির সেবায় রয়েছেন, পরম মাধুর্যগত ভক্তগণ সেই গোলোক বা শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাস্থলী নিত্য আবাস সেই সর্বোচ্চ

লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য পরম ভক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর প্রেমভাব নিয়ে প্রেমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন শ্বেতবরাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌরহরিরূপে। তিনি গোলোকের প্রেমরত্ন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন প্রচার করে ধন্যকলির জীবদের তাঁর ধামে নেওয়ার সুদুর্লভতম সুযোগ সৌভাগ্য দান করেছেন। যা চৌদ্দভুবনের মধ্যে সেই সুযোগ কখনও পাওয়া যায় না। অবশ্য ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলে থাকেন যে, শ্রীগোলোকের দুই ধাম—কৃষ্ণলোক ও গৌরলোক। যে ভক্তগণ কেবল ব্রজের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় তৎপর তাঁরা কেবল কৃষ্ণলোকে গমন করেন, আর যাঁরা কেবল গৌড় আনুগত্যে শ্রীগৌরসেবায় তৎপর, তাঁরা কেবল গোলোকের গৌরধামে গমন করেন। আর যাঁরা ব্রজ ও গৌড়ের এই ঐক্যগত ভক্ত, তাঁরা যুগপৎ উভয়লোকেই গতিলাভ করেন। সেটি আরও অনেক বেশী চমৎকারিত্বের ব্যাপার।

যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে অবস্থান কালে শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ বা পাপাচার করে চলেন, তাঁদের পাতাল লোকের দিকে যে গ্রহলোকে উপযুক্ত দণ্ড ভোগের জন্য গতি হয় সেই গ্রহের নাম নরক। সেখানে সূর্যদেবের পুত্র যমরাজ অবস্থান করছেন। পৃথিবী থেকে সেই যমপুরী বা নরক গ্রহের দূরত্ব ৭ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল।

বৈদিক পুণ্য আচরণকারী মানুষ স্বর্গলোকে গমন করেন। ভুবর্লোকের উপরের দিকে স্বর্গলোক অবস্থিত। পাপ ও পুণ্য মিশ্র আচরণকারীর সমস্ত হিসাব যমরাজের হিসাবরক্ষক শ্রীচিত্রগুপ্ত লিপিবদ্ধ করে রাখেন, মৃত্যুর পর সবকিছু বিচার করে আমাদের কোন্ শাস্তি ও কোন্ পুরস্কার—সব ব্যবস্থাই যমরাজ করে থাকেন।

কিন্তু যাঁরা কলিযুগে গৌরহরির হরিনাম সংকীর্তনে ব্রতী হবেন তাঁদের গতি যমপুরীতে নয়। বিষ্ণুদূতগণ তাঁদের সরাসরি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মজ্যোতি স্তর পেরিয়ে বৈকুণ্ঠ জগতের দিকে নিয়ে যাবেন। ভক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। সেই অনুসারে তাদের গতিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টির উৎস

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে বললেন, হে পিতামহ! যিনি সবার সৃষ্টিকর্তা, যাঁর সৃষ্টিকর্তা কেউই নেই, যাঁকে অচ্যুত, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি নামে সংসারের লোকগণ জেনে থাকেন, সেই ভগবানের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্তন করুন, আমি শুনতে খুবই বাসনা করি।

ভীষ্মদেব বললেন, "রাজা যুধিষ্ঠির! জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে ভগবানের বৃত্তান্ত শুনেছি। মহাতপা বাল্মীকি, অসিত, দেবল ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়—তাঁরা ভগবানের বিষয় অতি অদ্ভুতরূপে কীর্তন করেছেন। তাঁরা বলেছেন পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এক ব্যক্তি হয়েও সর্বব্যাপী। সেই পুরুষোত্তম ভগবান যাবতীয় সৃষ্টির উৎস। তাঁকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। তাঁর কেউ সৃষ্টিকর্তা নেই। তাঁকে কেউ নারায়ণ বলেন, কেউ গোবিন্দ বলেন। তিনি প্রথমে আকাশ, বায়ু, মাটি, অগ্নি, জল এই পাঁচ মহাভূতের সৃষ্টি করে স্বয়ং জলের উপরে শয়ন করলেন। তারপর তিনি প্রথমে মনের সঙ্গে অহংকারের সৃষ্টি করলেন। সেই অহংকারের বলে সব জীবের সংসার কার্য নির্বাহ হচ্ছে। অহংকারের সৃষ্টির পর সেই ভগবানের নাভিদেশে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক দিব্য পদ্ম সম্ভূত হল। সেই নাভিপদ্ম থেকেই ব্রহ্মার জন্ম হল। সেই পদ্মজ্যোতিতে সর্বদিক উদ্ভাসিত হল। ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর মধুনামে তমোগুণ সম্পন্ন এক অসুর আবির্ভূত হল। সেই মধু অসুরটি ব্রহ্মার উপর অত্যাচার করতে শুরু করল। ভগবান তখন ব্রহ্মার উপকারার্থে সেই মধু অসুরকে বিনষ্ট করলেন। সেইজন্য ভগবানের একটি নাম হল মধুসূদন। মধু নিহত হলে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের উৎপত্তি হল। তাঁরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। মরীচি থেকে কশ্যপ সম্ভূত হন। মরীচির জন্মের পূর্বে ব্রহ্মার বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে জন্ম হল দক্ষ। দক্ষের প্রথমে ১৩টি কন্যার জন্ম হল। বড় কন্যার নাম দিতি। কশ্যপ সব কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তারপর দক্ষের আবার দশটি কন্যা জন্মালো। কশ্যপের পত্নীদের থেকেই দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, গো, অশ্ব, পক্ষী, মৎস, উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্ম হন। তারপর মধুসূদন বিবেচনা করে দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, মেঘ ও ব্রহ্মাণ্ডের

যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করলেন। তারপর ভগবান মধুসূদন নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে একশত জন করে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন করলেন। চারবর্ণ সৃষ্টির বিধান করে, ব্রহ্মাকেই সর্বজীবের অধ্যক্ষ রূপে নিয়োগ করলেন।

সেই সময় আরও অনেক কিছু বিভাগ করা হল। ইন্দ্রকে দেবতার রাজা, যমরাজকে পাপীদের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধন রক্ষক, বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি করা হল।

হে যুধিষ্ঠির, সৃষ্টির প্রথমদিককার জীবন যাপনের কথা যা শুনেছি তাই বলি, যে ব্যক্তি যতদিন ইচ্ছা সে ততদিন জীবিত থাকতে পারত। যমের শাসনভয়ে কেউ শঙ্কিত ছিল না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না। ইচ্ছা করলেই লোকে মৈথুন ছাড়াই সন্তান উৎপাদন করতে পারত। দর্শন মাত্রই সেটি সম্ভব হত। ত্রেতাযুগে লোকে কামিনীদের স্পর্শ করলেই তাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে সমর্থ হত। দ্বাপর যুগ থেকেই মৈথুনযুগ প্রচলিত।

হে যুধিষ্ঠির, এখন তুমি যে-সব পাপাত্মাদের দেখতে পাও যেমন অন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক, মদ্রক, যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্বরজাতের লোকেদের। এরা নিয়তই সারা অবনী মণ্ডলে পাপাচার করে চলেছে। এদের ব্যবহারটা কাক ও শকুনদের মতোই কদর্য। সত্যযুগে এদের নামগন্ধও ছিল না। নিতান্ত ত্রেতাযুগ থেকে ক্রমে ক্রমে এদের সংখ্যা নিতান্তই বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই পৃথিবী অসহ্য বোধ করেছে। তাই ভগবান মধুসূদন পৃথিবীর দুঃখ লাঘব করবার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রের বিশাল যুদ্ধের আয়োজন করেছেন এবং যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করছে।

হে ধর্মরাজ! তুমি ভালো করে জেনে রেখো, এই মহাত্মা বাসুদেব থেকেই সবকিছু হচ্ছে। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানুষ বলে কখনো মনে করো না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনির্বচনীয়। (মহাভারত, শান্তিপর্ব ২০৭ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণ থেকে সর্ব অবতারের প্রকাশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি (১০/৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

'বেশী আর কি বলব, আমি আমার প্রকাশের একটি অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকি।'

পরম সত্য বা পরম তত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে জানার জন্য তিনটি পন্থা হচ্ছে—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। তিন পন্থায় যথাক্রমে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে উপলব্ধ হন।

১। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের অঙ্গকান্তি বা দেহ নির্গত রশ্মি। সেই জ্যোতি নির্বিশেষ বা নিরাকার রূপে প্রকাশিত। ব্রহ্ম সর্বত্র প্রকাশিত।

২। পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের এক অংশপ্রকাশ। জীবহৃদয়ে চতুর্ভুজ বিষ্ণু পরমাত্মা অবস্থান করেন।

৩। ভগবান হচ্ছেন আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গোলোকে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপে নিত্য বিরাজ করেন।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে ভগবানের ক্ষুদ্র আংশিক উপলব্ধি মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—মত্তঃ পরতরং নান্যৎ। 'আমার থেকে পরতর আর কিছুই নেই, কেউই নেই।'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন, ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সর্বতোভাবে পূর্ণ ভগবানের রূপ অনুভব করা যায়। যদিও তিনি এক, তবুও তিনি অনন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন। প্রথমে তিনি তিন রূপে প্রকাশিত।

১। **স্বয়ং রূপ ঃ** যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা করে না, সেই স্বতঃসিদ্ধ রূপকে বলা হয় স্বয়ং রূপ। ব্রজের গোপবালক রূপ হচ্ছে স্বয়ং রূপ। স্বয়ং রূপ দুই প্রকারের—১) **স্বয়ং রূপ**—ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং

২) **স্বয়ং প্রকাশ**—লীলাবিস্তারের জন্য নিজেকে বহু সংখ্যায় দুই ভাবে প্রকাশ—**প্রাভব প্রকাশ** (ব্রজে রাসে ও দ্বারকায় মহিষি বিবাহে সবার কাছে একই সঙ্গে এক-এক কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ) এবং **বৈভব প্রকাশ** (ব্রজে গোপবেশ বলদেব, মথুরা বা দ্বারকায় ক্ষত্রিয়বেশ বাসুদেবরূপে প্রকাশ)। প্রাভব প্রকাশে ভগবানের রূপ একই কিন্তু বহুমূর্তি রূপে প্রকাশ। বৈভব প্রকাশে ভগবানের বপু, আকৃতি, ভাবাবেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এমনরূপে প্রকাশ।

২। **তদেকাত্ম রূপ ঃ** যে রূপ স্বয়ং রূপের সঙ্গে একরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি ও বৈভব (অঙ্গকান্তি ও চরিত্র) প্রভৃতিতে ভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, তাকে তদেকাত্ম রূপ বলা হয়। তদেকাত্ম রূপ দুই প্রকারের—১) **স্বাংশক প্রকাশ**—শ্রীকৃষ্ণের অংশ স্বরূপতঃ কৃষ্ণ হলেও আকারে ও বর্ণে কৃষ্ণ থেকে পৃথক এবং শক্তিতে ন্যূন, ভগবানের এই প্রকাশকে স্বাংশ প্রকাশ বলে। ছয় প্রকারের অবতারগণই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ। যেমন—পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রমুখ অবতার। ২) **বিলাস প্রকাশ**—বিলাস প্রকাশ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বিলাস প্রকাশ দুই প্রকারের। যেমন (১) প্রাভব বিলাস—(আদি চতুর্ব্যূহ)—মথুরায় বাসুদেব ও সংকর্ষণ, দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। (২) বৈভব বিলাস—(২৪ মূর্তি) দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, তাঁদের প্রত্যেকের তিন-তিনটি করে বারো মূর্তি প্রকাশ বিগ্রহ এবং দুটি করে আট মূর্তি বিলাস বিগ্রহ।

আদি চতুর্ব্যূহ বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ রূপে অবস্থিত। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বাসুদেবের প্রকাশ বিগ্রহ—কেশব, নারায়ণ, মাধব। বাসুদেবের বিলাস বিগ্রহ—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম। সংকর্ষণের প্রকাশ বিগ্রহ—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন। সংকর্ষণের বিলাস বিগ্রহ—উপেন্দ্র

ও অচ্যুত। প্রদ্যুম্নের প্রকাশ বিগ্রহ—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর। প্রদ্যুম্নের বিলাস বিগ্রহ—নৃসিংহ ও জনার্দন। অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিগ্রহ—হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। অনিরুদ্ধের বিলাস বিগ্রহ—হরি ও কৃষ্ণ (এই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন নন)।

প্রকাশবিগ্রহ কেশবাদি ১২জন বিষ্ণু অগ্রহায়ণাদি বারো মাসের অধিদেবতা। বৈভব বিলাসের মোট চব্বিশ মূর্তিই চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। সিদ্ধান্ত সংহিতাতে বৈকুণ্ঠে এই চব্বিশ বিষ্ণুরূপের প্রত্যেকের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর নীচের ডান হাত, তারপর উপরের ডান হাত, তারপর উপরের বাম হাত এবং তারপর নীচের বাম হাতে যথাক্রমে এক-এক অস্ত্র ধারণ করেন। যেমন বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্ম, সংকর্ষণ—গদাশঙ্খপদ্মচক্র, প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খগদাপদ্ম, অনিরুদ্ধ—চক্রগদাশঙ্খপদ্ম, কেশব—পদ্মশঙ্খচক্রগদা, নারায়ণ—শঙ্খপদ্মগদাচক্র, মাধব—গদাচক্রশঙ্খপদ্ম, গোবিন্দ—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ, বিষ্ণু—গদাপদ্মশঙ্খচক্র, মধুসূদন—চক্রশঙ্খগদাপদ্ম, ত্রিবিক্রম—পদ্মগদাচক্রশঙ্খ, বামন—শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, শ্রীধর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খ, হৃষীকেশ—গদাচক্রপদ্মশঙ্খ, পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্মচক্রগদা, দামোদর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খ, পুরুষোত্তম—চক্রপদ্মশঙ্খগদা, অচ্যুত—গদাপদ্মচক্রশঙ্খ, নৃসিংহ—চক্রপদ্মগদাশঙ্খ, জনার্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদা, হরি—শঙ্খচক্রপদ্মগদা, কৃষ্ণ—শঙ্খগদাপদ্মচক্র, অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্র, উপেন্দ্র—শঙ্খগদাচক্রপদ্ম।

৩। **আবেশ ঃ** জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি কলার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যে সমস্ত মহান জীবে ভগবান প্রতীয়মান আছেন, তাঁরাই আবেশ। আবেশ দুই প্রকারের। ভগবৎ আবেশ (কপিলদেব ও ঋষভদেব) এবং ভগবৎ শক্তির আবেশ (চতুষ্কুমার, নারদ, পৃথু, পরশুরাম প্রমুখ)।

শ্রীকৃষ্ণের ছয় প্রকার অবতার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

১। **পুরুষাবতার ঃ** শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ শ্রীবলরাম। শ্রীবলরাম থেকে মহাসংকর্ষণ। মহাসংকর্ষণ থেকে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ। এই তিন বিষ্ণু বা পুরুষাবতারের মধ্যে প্রথম পুরুষ মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। তাঁর লোমকূপ থেকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘর্ম বিন্দু আকারে সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর থেকেই কারণসমুদ্র নামক জলরাশি উৎপন্ন হয়েছে। সেই জলে তিনি স্বরূপানন্দ-সমাধিগত হয়ে শয়ন করে থাকেন। এই মহাবিষ্ণু মহৎ তত্ত্ব রূপ প্রপঞ্চ আত্মক সূক্ষ্ম জীবদেরকে বীজরূপে মায়াতে আহিত করেন।

সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক অংশে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকেই সৃষ্টির আদি জীব ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে ফাঁকা গ্রহলোকগুলিকে জীবে পরিপূর্ণ করতে শ্রীব্রহ্মা ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হন। ভগবানের চিৎকণা জীবকুল ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট পঞ্চ ভূতাত্মক পদার্থ সমন্বিত দেহ ধারণ করে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করছে।

ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে নিম্নভাগে গর্ভোদকসমুদ্রে এই বিষ্ণু শায়িত থাকেন এবং ঊর্ধ্বভাগে ক্ষীরসমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হন। এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন। জড়জগতের লোক তাকেই ভগবান নারায়ণ বলে জানে।

২। **লীলাবতার ঃ** ব্রহ্মার প্রতিদিনে বা প্রতিকল্পে ভগবানের লীলাবতার এই জগতে আবির্ভূত হন। তাঁদের কখনো কখনো কল্পাবতারও বলা হয়।

লীলাবতার পঁচিশ মূর্তি—১) চতুষ্কুমার, ২) নারদ, ৩) বরাহ, ৪) মৎস্য, ৫) যজ্ঞ, ৬) নরনারায়ণ, ৭) কার্দমি কপিল, ৮) দত্তাত্রেয়, ৯) হয়শীর্ষা, ১০) হংস, ১১) ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ, ১২) ঋষভ, ১৩) পৃথু, ১৪) নৃসিংহ, ১৫) কূর্ম, ১৬) ধন্বন্তরি, ১৭) মোহিনী, ১৮) বামন, ১৯) ভার্গব পরশুরাম, ২০) রাঘবেন্দ্র, ২১) ব্যাস, ২২) প্রলম্বারি বলরাম, ২৩) কৃষ্ণ, ২৪) বুদ্ধ, ২৫) কল্কি। এদের মধ্যে হংস ও মোহিনী অচিরস্থায়ী। কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধনন্তরি ও ব্যাস চিরস্থায়ী। কূর্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বারি বলরাম বৈভব অবতার নামে বর্ণিত।

৩। **গুণাবতার ঃ** গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত তিন গুণাবতার আবির্ভূত হন। তারা হলেন বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণের অধীশ্বর রূপে ভগবান যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন নাম ধারণ করেন। ১) ব্রহ্মা দুই রকমের হতে পারে। জীবতত্ত্ব কিংবা বিষ্ণুতত্ত্ব। যে কল্পে ব্রহ্মা পদবী লাভের উপযুক্ত জীব না পাওয়া যায় সেই কল্পে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকার্য করে থাকেন। কোন কোন মহাকল্পে জীব উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হন। শত জন্ম কোন ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম নিষ্ঠাভরে পালন করে চললে তিনি ব্রহ্মার পদ লাভ করতে পারেন। ভগবানের ইচ্ছানুসারে কোন কল্পে গর্ভোদক থেকে, কোন কল্পে তেজ বা বায়ু থেকেও ব্রহ্মার জন্ম হয়ে থাকে। বর্তমান ব্রহ্মা জীবতত্ত্ব। তার চার মাথা, অষ্ট নেত্র, অষ্ট বাহু। ২) শিব বা রুদ্র একাদশ ব্যূহযুক্ত। সেই একাদশ রুদ্রের নাম অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। প্রায় রুদ্রেরই দশ বাহু ও পাঁচ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিন নয়ন। কোন কল্পে ব্রহ্মার ললাট থেকে, কোন কল্পে বিষ্ণুর ললাট থেকে রুদ্রের আবির্ভাব হয়। কল্প অবসানে সংকর্ষণ থেকেও কালাগ্নি রুদ্রের উৎপত্তি হয়ে থাকে। বৈকুণ্ঠ জগতে সদাশিব নামে যে তমোগুণ সম্বন্ধরহিত শিব রয়েছেন তিনি স্বয়ং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। ৩) ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জনার্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে শেষশয্যায় বর্ষার চারি মাস নিদ্রা যান। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের কোন সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে এই বিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন ক্ষীর সমুদ্রের সমীপে।

৪। **মন্বন্তরাবতার ঃ** ব্রহ্মার দিবাভাগে চৌদ্দ জন মনু রাজত্ব করেন। সেই রাজত্বকালকে মন্বন্তর বলা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগ একাত্তর বার আবর্তিত হলে এক মন্বন্তর হয়। প্রতি মন্বন্তরে ভগবানের এক এক অবতার ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন। তাঁরা হলেন—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহৎভানু। এই চৌদ্দ মূর্তির মধ্যে যজ্ঞ ও বামন লীলাবতারও বটে। সুতরাং মন্বন্তরাবতার দ্বাদশ মূর্তি। কখনও কখনও এই অবতারকে বৈভব অবতারও বলা হয়। বর্তমান বৈবস্বত (সপ্তম) মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার হচ্ছেন শ্রীবামনদেব।

৫। **যুগাবতার ঃ** প্রতি যুগে যুগধর্ম প্রবর্তন করবার জন্য এক এক যুগাবতার অবতীর্ণ হন। সত্য যুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপর যুগে শ্যামবর্ণ এবং সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ অবতার অবতীর্ণ হন এবং বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ অবতীর্ণ হন। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যুগাবতার চার মূর্তি। তাঁদের অঙ্গবর্ণ এবং তাঁদের নাম একই। প্রতি মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারই উপাসনা-বিশেষের প্রচারের জন্য সেই সেই মন্বন্তরের সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগে যথাক্রমে শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হন। যেমন বর্তমান সপ্তম বা বৈবস্বত মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার হচ্ছেন ভগবান শ্রীবামনদেব। তিনিই যুগাবতার রূপে প্রকটিত হন। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম সব মন্বন্তরে হলেও যুগবিশেষে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। তা হল এই যে, যে দ্বাপরে গোলোকধাম থেকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই কালে শ্যামবর্ণ যুগাবতারও শ্রীকৃষ্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং তার অব্যবহিত কলিযুগে

স্বর্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতারও প্রবিষ্ট হন। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে ও কলিতেই এরকমটি ঘটে থাকে।

৬। **শক্ত্যাবেশ অবতার ঃ** এই অবতার দুই রকমের— ভগবৎ আবেশ এবং ভগবৎ শক্তির আবেশ। কপিলদেব ও ঋষভদেব হলেন ভগবৎ আবেশ। আর ভগবৎ শক্তির আবেশ হলেন— বৈকুণ্ঠস্থ শেষনাগ (স্বসেবন-শক্তি), অনন্তদেব (ভূধারণ-শক্তি), ব্রহ্মা (সৃষ্টি-শক্তি), চতুঃসন (জ্ঞান-শক্তি), নারদমুনি (ভক্তি-শক্তি), পৃথু মহারাজ (পালন-শক্তি) এবং পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি) এই সাত মূর্তি।

ব্রহ্মার কল্পের আরম্ভে ভগবান বিষ্ণু লীলাবশতঃ চতুর্ব্যূহ রূপে প্রকাশিত হন। বাসুদেব রূপে তিনি জীবগণকে গতি প্রদান করেন। সংকর্ষণ রূপে তিনি জগত সংহার করেন। প্রদ্যুম্ন রূপে তিনি জগত সৃষ্টি করেন। অনিরুদ্ধ রূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন। ভগবান শ্রীহরি 'আমি আমার উদরগত চেতনসমূহকে তাদের স্বরূপ অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করব।' এই সংকল্প করে বাসুদেব নামে প্রকটিত হলেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর শক্তি লক্ষ্মী বা রমাদেবী দ্বিতীয় রূপ ধারণ করলেন। বাসুদেব পত্নীকেই পণ্ডিতেরা 'মায়া' নামে অভিহিত করেন। সেই পরম ভগবান সৃষ্টির প্রলয়কারণভূত দেহ প্রকটিত করে সংকর্ষণ নামে আবির্ভূত হলেন। তাঁর আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মীদেবী 'জয়া' নামে প্রকাশিত হলেন। সেই ভগবান সৃষ্টির জন্য প্রদ্যুম্ন রূপে আবির্ভূত হলে লক্ষ্মীদেবী 'কৃতি' নামে আবির্ভূত হলেন। সেই ভগবান জগত পালনের জন্য অনিরুদ্ধ নামে আবির্ভূত হলে লক্ষ্মীদেবী 'শান্তি' নাম ধারণ করলেন।

প্রতি যুগে সমস্ত ভুবন দুষ্ট দৈত্যদের দ্বারা উপদ্রুত হলে এবং ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে শ্রীভগবান সর্বপ্রকার প্রাণীরূপে অবতরণ করে কখনো জলজন্তু, কখনো পশু, কখনো পাখি, কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয় মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অবতীর্ণ হলেও জড়জাগতিক সুখ-দুঃখাদি দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট নন। নিজে মায়া দ্বারা জড়জাগতিক লোকের

দৃষ্টিতে কখনো গর্ভজাত শিশুর মতো, কামুক, ভীত, দুঃখী, ক্ষুধার্ত, বিরহী, বদ্ধ, মলিন, মূর্খ, বিরক্ত, আঘাতপ্রাপ্ত ইত্যাদি প্রাকৃত লোকের মতো অবস্থান দেখিয়েও স্বভাবত সর্বদোষশূন্য থেকে অজ্ঞদেরকে বিড়ম্বিত করেন। দৈত্যদেরকে ভ্রান্ত ও বঞ্চিত করেন। সমস্ত পারমার্থিক রহস্য না জেনে যারা বিষ্ণু-নিন্দা করে, তাঁর তত্ত্ব না জেনে যারা তাঁর প্রতি ভক্তি করে না তাদেরকে তিনি অন্ধতামস লোকে নিক্ষেপ করেন। যারা ভগবানের সেবক ও শরণাগত হয়ে ভক্তিপূর্বক উপাসনা করে তাদেরকে উচ্চ পদবীতে নিয়ে যান। আর যারা এই উভয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদেরকে সংসারে বারংবার আবর্তন করান। ভুবনগুলিতে ভগবান নানারূপে অবতরণ করে বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন। সেই সমস্ত লীলা দ্বারা ভক্তদের ভক্তি উৎপাদন করেন। বিদ্বেষীদের বিরোধ বর্ধন করেন।

ভগবানের অবতারসমূহে জ্ঞান-অবতার, বল-অবতার ও উভয়াবতার এই ত্রিবিধ অবতার হয়। জ্ঞান-অবতারসমূহে জ্ঞান দান করে ভক্তদের উদ্ধার, বল-অবতারে দুষ্ট নিগ্রহ দ্বারা ভক্তদের পালন এবং উভয়-অবতারে দুই প্রকার কার্য করেন। ব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয়, পার্থসারথি কৃষ্ণ, নর, হরি, মহিদাস, হংস ও বুদ্ধ—এঁরা জ্ঞান-অবতার বিষ্ণু। কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দশরথ নন্দন রাম, কল্কি, শিশুমার, যজ্ঞ, গোপেশ কৃষ্ণ, ধন্বন্তরি—এঁরা বলাবতার বিষ্ণু। হয়গ্রীব, ঋষভ, মৎস্য, যাদব কৃষ্ণ—এঁরা উভয়াবতার বিষ্ণু।

ভগবানের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ সৃষ্টির আদিতে 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'অনন্তআসন' নামে দুইটি ধাম প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ, মধ্যভাগে শ্বেতদ্বীপ ও নিম্নভাগে অনন্তআসন। সমস্ত স্থানেই মুক্ত ব্রহ্মা, শিবাদি দেবগণ ও মুক্তশেষ গরুড়, বিষ্বক্সেন, নন্দ-সুনন্দ, জয় ও বিজয় প্রভৃতি পরিবারবর্গ দ্বারা সেবিত হয়ে প্রেয়সী লক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান বিরাজ করেন। সব স্থানেই মুক্তস্থান ও অমুক্তস্থান নামে দুইটি বিভাগ আছে। ভগবান জগত থেকে পৃথক হলেও সর্বত্রই তারা বিরাজিত।

অগণিত ব্রহ্মাণ্ড

মহা আকাশে অসংখ্য অগণিত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। আমরা একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রয়েছি। কোনও কোনও ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার শতকোটি যোজন, কোনওটি নিখর্ব বা 'দশ সহস্র কোটি' যোজন, কোনওটি পদ্মাযুত বা 'দশ লক্ষ কোটি অজুত' যোজন।

সূর্য থেকে ব্রহ্মাণ্ডের গোলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৩০০ কোটি কিলোমিটার এই হিসাব অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ডের গোলোকের অন্তবর্তী এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তের দূরত্ব ৬০০ কোটি কিলোমিটার। এইভাবে আমাদের ছোট্ট ব্রহ্মাণ্ডটির আভ্যন্তরীণ বিস্তার বা পরিধি হচ্ছে ১৩,৬২০ কোটি কিলোমিটার। ব্রহ্মাণ্ডের পুরু আবরণীগুলিকে যুক্ত করলে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার-পরিমাণ আরও অনেকগুণ বাড়বে।

মহাকাশের ব্রহ্মাণ্ড সমূহের ভেতরে কতকগুলি ভুবন আছে। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ ভুবন, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে অজুত ভুবন, কোনওটিতে সহস্র ভুবন, কোনটিতে শতভুবন, কোনওটাতে সত্তর, কোনওটাতে পঞ্চাশ, কোনওটাতে কুড়িটি ভুবন রয়েছে। আমাদের ছোট্ট ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দটি ভুবন রয়েছে। সেগুলি হল— ১) ভূলোক, ২) ভুবর্লোক, ৩) স্বর্গলোক, ৪) মহর্লোক, ৫) জনলোক, ৬) তপোলোক, ৭) সত্যলোক, ৮) অতল, ৯) বিতল, ১০) সুতল, ১১) তলাতল, ১২) মহাতল, ১৩) রসাতল, ১৪) পাতাললোক। সত্যলোকের উত্তরে ধ্রুবলোক এবং পাতাললোকের দক্ষিণে নরকলোক বিদ্যমান। অবশ্য বিশাল ধ্রুবলোক ব্রহ্মার শাসনাধীন নয়।

ব্রহ্মার আবাস সত্যলোকে। ব্রহ্মার বহু মাথা, বহু বাহু। কোন কোনও ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোটি মুখ, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষমুখ, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সহস্রমুখ, কোথাও বা শত মুখ, কোথাও চৌষট্টি মুখ, কোথাও অষ্টমুখ। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হচ্ছেন চতুর্মুখ অর্থাৎ চার মাথা।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে বিভিন্ন দেশ বা ভুবন বিভাগ রয়েছে, প্রায়ই ব্রহ্মাণ্ডগুলির জীবও সমতুল্য, তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি প্রায়ই সমতুল্য। ৮৪ লক্ষ রকমের জীব প্রজাতি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই আছে বলা যায়।

শ্রীকূর্মপুরাণে বলা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি কখনও কখনও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একই সঙ্গে সংহার করে থাকেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হয়েছে, জগৎপতি শ্রীহরি যখন সেই সমস্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের এক কালে সংহার করে আত্মারামভাবে অবস্থান করেন সেই সময়টি তাঁর রাত্রি বলে কীর্তিত হয়। পুনরায় যখন শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ডগুলি সৃষ্টি করেন তখন কখনও ভিন্ন আকারে, কখনও বা একরূপ আকারে সৃষ্টি করে থাকেন, সেটি ভগবানের দিন।

চিন্ময়-জগৎ ভগবানের অঙ্গজ্যোতিতে আলোকিত থাকে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অন্ধকার। সূর্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্ক গ্রহ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত।

সমগ্র বিশ্ব পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সত্তার অভিব্যক্তি। শাশ্বত কাল রূপে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। শাশ্বত কাল হচ্ছে জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার আদি উৎস। কাল আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের সাধারণ মাপকাঠি। যার মাধ্যমে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে মাপি। প্রকৃত বিচারে কালের আদি নেই বা অন্ত নেই। জড় জগত সৃষ্টি হয়েছে, ধ্বংস হবে। পূর্বে অস্তিত্ব ছিল এবং ভবিষ্যতে যথাসময়ে সৃষ্টি পালন ও ধ্বংস হবে। কালের এই সুসংবদ্ধ কার্যকলাপ নিত্য। জড়জগতের প্রকাশ ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তা মিথ্যা নয়।

জীব

মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা। তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের সর্বত্র জীব সৃষ্টি করতে ব্রহ্মা ভগবানের দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হন। জীব হচ্ছে চিৎকণা। সেই কণাটি আসছে ভগবানের কাছ থেকে। আর একটি শরীর ধারণ করে জীব রয়েছে। যদিও প্রথম দিকে ব্রহ্মার মন থেকেই বিভিন্ন মুনি ঋষি জন্ম লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টির প্রক্রিয়া তিনি প্রবর্তন করেন। জীবের দেহটি ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস), ব্যোম (আকাশ) দিয়ে তৈরি। শ্রীব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই ধরনের জীব সৃষ্টি করলেন। (১) স্থাবর : যারা চলাফেরা করতে পারে না, একস্থানেই থাকে। (২) জঙ্গম : যারা স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাফেরা করতে পারে। ৮৪ লক্ষ রকমের প্রজাতির জীব সৃষ্টি করলেন। সেই সমস্ত জীব কেউ জলচর বা জলে বাস করে, কেউ ভূচর বা মাটিতে বাস করে, কেউ উভচর বা জলে ও স্থলে বাস করতে পারে, কেউ খেচর আকাশে উড়তে পারে।

৮৪ লক্ষ রকমের প্রজাতি জীবেদের মধ্যে **জলজ** জীব ৯ লক্ষ রকমের, **গাছপালা** ২০ লক্ষ রকমের, **কীটপতঙ্গ** ১১ লক্ষ রকমের, **পাখী** ১০ লক্ষ রকমের, **পশু** ৩০ লক্ষ রকমের এবং **মানুষ** ৪ লক্ষ রকমের। ৮০ লক্ষ প্রজাতির জীবকে মানবেতর প্রাণী বলা হয়।

প্রত্যেক জীবেরই কতকগুলি প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত জৈব প্রবৃত্তি চার রকমের। আহার, নিদ্রা, দেহরক্ষা, মৈথুন। ১) **আহার**—তারা কিছু খাবে। কোনও কিছু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করবে। সেজন্য তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ২) **নিদ্রা**—কর্ম করার ফলে স্বভাবতই তারা ক্লান্ত শ্রান্ত হবে। তাই তারা বিশ্রাম বা নিদ্রা গ্রহণ করে। ৩) **দেহরক্ষা**—জাগতিক ত্রিবিধ-ক্লেশ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য সে ঘরবাড়ি বা কোনও আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। ৪) **মৈথুন**—বংশবিস্তার করবার জন্য সে প্রবৃত্ত হয়।

জড়জগতে জড়শরীর ধারী জীবের ছয়টি বিকার পরিলক্ষিত হয়। (১) জন্ম— সে জন্মগ্রহণ করে। (২) অবস্থান— কিছুকাল যে প্রজন্মে জন্মেছে সেই প্রজন্মে থাকে। (৩) বর্ধন— শিশুরূপে জন্মালেও তার বৃদ্ধি হতে থাকে। (৪) বিপরিণাম— সে বিশেষরূপে পরিণত হয়, কায়-মনো-বুদ্ধিতে। (৫) অপক্ষয়— তারপর তাকে জরা ও বার্ধক্য গ্রস্ত হতে হয়। কায়-মনো-বুদ্ধির ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে। (৬) বিনাশ— অবশেষে তার দেহত্যাগ বা মৃত্যু হয়।

দেহত্যাগের পর তার জড় শরীরটি পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মিশে যায়। আর তার চেতনা অনুসারে নতুন প্রজন্মে তাকে গমন করতে হয়।

জীব হচ্ছে চিৎকণা মাত্র। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা। যার পরিমাণ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হচ্ছে একটি চুলের অগ্রভাগের সহস্রভাগের একভাগ। ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্র নেই যার মাধ্যমে তাকে দেখা যায়। সেই চিৎকণাটি নিত্য। তার বিনাশ নেই। পরমেশ্বর পরমাত্মার অংশকণা রূপে তা আখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। যত জীব রয়েছে, সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, সমস্ত জীবই সনাতন। অর্থাৎ জীবাত্মা মৃত্যুহীন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় বলেছেন, জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। প্রতিটি জীব স্বরূপত ভগবানের সেবক। শ্রীকৃষ্ণের বিভু গুণসমূহ অতি সূক্ষ্ম কণা রূপে জীবের মধ্যেও রয়েছে। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ভগবান হচ্ছেন প্রভু আর জীব হচ্ছে দাস। ভগবান যেমন স্বতন্ত্র, জীবও স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে সে বৈকুণ্ঠ জগতে কিংবা ব্রহ্মাণ্ড জগতে অবস্থান করছে। বৈকুণ্ঠ জগতের সমস্ত জীব নিত্যমুক্ত। কেননা তারা সর্বদাই তাঁদের উপাস্য-সেবাসুখে মগ্ন। দুঃখ, জড়সুখ, নিজ সুখ ইত্যাদি কখনই তারা জানেন না। ভগবৎ প্রেমই তাঁদের জীবন। শোক, দুঃখ, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি প্রভৃতি কি বস্তু তাঁরা তা জানেন না। তাঁরা মুক্ত জীব। তাঁদের সংখ্যাই অধিক।

জড় ব্রহ্মাণ্ড-জগতের জীবদের বলা হল নিত্য বদ্ধ। তারা বহুকাল অবধি ভগবৎ সেবা-বিমুখ অবস্থায় রয়েছে। তারা সর্বদা মায়া-সুখ ভোগের জন্য উন্মুখ। জড় জগতের অতীত কোনও জগৎ বলে যে কিছু আছে তা তারা জানে না।

জড় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বদ্ধ জীবেরা পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত। যেমন—আচ্ছাদিত চেতন, সংকুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকশিত চেতন, পূর্ণ-বিকশিত চেতন।

১। **আচ্ছাদিত চেতন** ঃ গাছপালা, ঘাস ও পাথর গতিপ্রাপ্ত জীব আচ্ছাদিত চেতন। এদের চেতনধর্মের পরিচয় লুপ্ত প্রায়।

২। **সংকুচিত চেতন** ঃ পশু, পাখী, সরীসৃপ, মাছ ইত্যাদি জলচর প্রাণী, কীটপতঙ্গ সংকুচিত চেতন। আহার নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছানুসারে যাতায়াত, নিজের স্বত্ববোধে পরের সঙ্গে বিবাদ, অন্যায় দেখলে ক্রোধ—এ সমস্ত সংকুচিত চেতনে পাওয়া যায়। কিন্তু এদের পরলোক জ্ঞান হয় না।

৩। **মুকুলিত চেতন** ঃ মানুষ মুকুলিত চেতন। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষের অনুভব ক্ষমতা, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার মানসিকতা থাকলেও যারা নীতিশূন্য ব্যক্তি, কিংবা নীতিযুক্ত হলেও নিরীশ্বর বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান নেই তারা মুকুলিত চেতন।

৪। **বিকশিত চেতন** ঃ যে মানুষেরা নীতিজ্ঞানযুক্ত এবং ঈশ্বর অনুসন্ধানী কিংবা সাধনভক্তি যুক্ত, তাঁরা বিকশিত চেতন।

৫। **পূর্ণবিকশিত চেতন** ঃ যে মানুষ সাধনভক্তি অনুশীলন করতে করতে ভাবভক্তিতে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হন, তিনি পূর্ণবিকশিত চেতন। জাগতিক বিষয় দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না।

মায়ামুক্ত বা মুক্তজীব দুই রকমের। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত।

১। **নিত্যমুক্ত** ঃ এই জীবগণ কখনও মায়াবদ্ধ বা জড়জগতের সুখ-দুঃখের কবল গ্রস্ত হননি। তাই এঁদের বলা হয় নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত জীব দুই রকমের। ঐশ্বর্যগত ও মাধুর্যগত। (১) ঐশ্বর্যগত নিত্যমুক্ত

জীবেরা পরব্যোম বৈকুণ্ঠের ভগবৎ পার্ষদ। সেই সমস্ত জীব হচ্ছে পরব্যোমস্থ মূল সংকর্ষণের কিরণ-কণা। (২) মাধুর্যগত নিত্যমুক্ত জীবেরা গোলোক বৃন্দাবনের ভগবৎ পার্ষদ। সেই সমস্ত জীব হচ্ছে সেই ধামস্থ বলরামের কিরণকণা।

২। **বদ্ধমুক্ত** ঃ এই জীবগণ কখনও মায়াবদ্ধ বা জড়জগতের সুখ-দুঃখের কবলগ্রস্ত হলেও সাধনবলে মুক্ত হয়েছে। এদের বলা হয় বদ্ধমুক্ত। বদ্ধমুক্ত জীব তিন রকমের। ঐশ্বর্যগত, মাধুর্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতির্গত। (১) ঐশ্বর্যগত বদ্ধমুক্ত জীবেরা সাধনকালে ঐশ্বর্যপ্রিয় হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে সালোক্য লাভ করেন। (২) মাধুর্যগত বদ্ধমুক্ত জীবেরা সাধনকালে মাধুর্যপ্রিয় হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিত্য সেবাসুখ লাভ করেন। (৩) ব্রহ্মজ্যোতির্গত বদ্ধমুক্ত জীবেরা সাধনকালে ভগবানের দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে মিশে যাওয়ার অভিলাষে ব্রহ্মসাযুজ্য গতি প্রাপ্ত হন।

ত্রিতাপ দুঃখ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দুঃখালয়ম্। এই জড়জগত দুঃখ দিয়ে তৈরী। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, জগতে তিন রকমের দুঃখ আছে। আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ ও আধিভৌতিক দুঃখ।

আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই রকমের। শারীরিক দুঃখ ও মানসিক দুঃখ। শারীরিক দুঃখ বহু রকমের। যেমন শিরোরোগ, জ্বর, শূল, ভগন্দর, অর্শ, শ্বাসকষ্ট, শোথ, সর্দি, অক্ষিরোগ, অতিসার, কুষ্ঠ ও জলোদর প্রভৃতি বহু রকমের। আবার মানসিক দুঃখ যেমন, কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন অনেক রকমের দুঃখ।

বাঘ, শেয়াল, পাখি, মানুষ, পিশাচ, সাপ, রাক্ষস, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জীব থেকে যে দুঃখ উৎপাদিত হয় তাকে **আধিভৌতিক** দুঃখ বলে।

ভূকম্প, ঝড়, বাতাস, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা প্রভৃতি দৈব-দুর্বিপাক থেকে যে দুঃখ উৎপাদিত হয় তাকে **আধিদৈবিক** দুঃখ বলে।

এই সমস্ত দুঃখ ছাড়া গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞানতা, মৃত্যু এবং নরকাদিতে উৎপন্ন দুঃখও হাজার হাজার রকমের।

জীব যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন সে গর্ভচর্ম দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তার পিঠ, ঘাড়, অস্থিসমূহ কুণ্ডল আকারে মুচড়ানো অবস্থায় থাকে। মা যখন অতিশয় অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন করে সেই ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা জঠরস্থ জীবের মহাকষ্ট বর্ধিত হয়। সে হাত-পা সঞ্চালন করতে পারে না। মলমূত্ররূপ মহাপঙ্কের মধ্যে শায়িত থাকে এবং সবসময় পীড়া অনুভব করে। সেই সময় সে শ্বাসহীন হয়ে গেলেও সচেতন ভাবে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে এবং নিজের কর্মদোষে কষ্ট পাচ্ছে বলে অনুভব করে।

তারপর যখন জন্মগ্রহণ করবার সময় হয় তার মুখ মলমূত্র ও শুক্রশোনিত দ্বারা লিপ্ত থাকে এবং তার অস্থিবন্ধন গর্ভসংকোচক বায়ু দ্বারা অতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে অত্যন্ত প্রবল সূতি নামক বায়ু

তার মুখ অধোদিকে করে দেয়। তারপর ভয়ানক ক্লেশে জীব তার মাতার জঠর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে।

জীব জন্মগ্রহণ করবার পর বাহ্য বায়ুর ছোঁয়া লেগে মূর্ছিত হয় এবং ধীরে ধীরে তার পূর্বসংস্কারগুলি কথা সে ভুলে যায়। সে একটি কৃমির মতো ভূমিতে পড়ে থাকে। নিজের দেহ চুলকাবার বা এদিক ওদিক ফিরবার শক্তিও তার থাকে না। একটু দুধ পান করবার জন্য বা নাড়াচাড়া করবার জন্য সে পরের অধীন হয়ে থাকে। অশুচি অবস্থায় সে ভূমিতে নিদ্রিত থাকে। কীট, মাছি, মশা প্রভৃতি কামড়ালেও তাদেরকে নিবারণ করতে পারে না।

তারপর সে তার বাল্যকালে আধিভৌতিক প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখ পেয়ে থাকে। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। সে কিছুতেই জানতে পারে না যে, 'আমি কোথায় এসেছি, আমি কে, আমি কোথায় যাব, আমার স্বরূপটা কিরকম, কোন্ বন্ধনে আমি এখানে আবদ্ধ আছি, এর কোন কারণ আছে কিনা, অথবা অকারণে এই দুঃখ ভোগ করছি কেন, আমার কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, কি বলা উচিত, কি বলা উচিত নয়, কিভাবে চলা উচিত, কোন্ কাজে দোষ আছে, কোন্ কাজে গুণ আছে?' এই রকম বহুবিধ ভাবনা তার মধ্যে আসে।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্য বহুবিধ ভাবনা তার থাকলেও কেবলমাত্র উদরপরায়ণ ও যৌন-ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে সে পশুর মতো জীবনযাপন করে থাকে এবং অজ্ঞানজনিত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে থাকে।

অজ্ঞান হচ্ছে তমোগুণের বা জড়তার স্বভাব। জড়তার আধিক্যবশত ক্রমশঃ জীবের প্রবৃত্তি বা কর্ম লোপ হয়ে থাকে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহকাল বা পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করে থাকে।

জীব যখন জরা কর্তৃক জর্জরিত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধ হলে তার শরীর শিথিল হয়ে পড়ে, দাঁতগুলি পড়ে যায়, চক্ষু কোটর মধ্যে ঢুকে যায়,

দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে, শরীরের যাবতীয় অস্থি প্রায় প্রকাশ পায়, দেহ ক্রমশঃ কুব্জ হয়ে আসে। সেই সময় জঠরের অগ্নি প্রায় নিভে যাওয়ায় আহারে অনীহা আসে। উঠাবসা, চলাফেরা, শোওয়াবসা করতে পারে না। তার ইন্দ্রিয়গুলো তার আয়ত্তে থাকে না। সদ্য অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করতে পারে না। একটি মাত্র কথা বলেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্বাস ও কাশের জ্বালায় ঘুমোতে পারে না। উঠাবসার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই সময় ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র হতে হয়। সে সমস্ত শৌচক্রিয়া রহিত হয়। আহার আর বিহারে হঠাৎ বেশি ইচ্ছা করলে পরিজনগণের হাস্যের কারণ হয়। তার জন্যও অনেকে বিব্রত হয়। যৌবনের আচরিত বিষয়গুলি কখনও কখনও সে স্মরণ করতে থাকে এবং নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধকালে নানাবিধ দুঃখ পেয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।' সেই সময় তার ঘাড়, হাত, পা ভেঙ্গে যায়। তার শরীর কাঁপতে থাকে। প্রায়ই সে মূর্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যকর ব্যাপার হল এই যে, সেই সময়ও একপ্রকার সাংসারিক মমতায় আকুল হয়ে সে চিন্তা করতে থাকে 'আমার এই ঐশ্বর্য, ধান-চাল, টাকা-কড়ি, পুত্র, ভার্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমাকে ছাড়া কিভাবে থাকবে।' সে নিজেকে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করে।

নিদারুণ মর্মভেদী মহারোগের দ্বারা পীড়িত হয়ে তার দেহের সমস্ত অস্থিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তার দুটি চোখ ঘুরতে থাকে, তালু, কণ্ঠ, ঠোঁট শুকিয়ে যায়। কফে কণ্ঠ বুজে যায়। কানে ঘুর ঘুর শব্দ হতে থাকে। সে যন্ত্রণায় কেবল বার বার হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। সে কিছু দেখতে চায়, কিছু বলতে চায়, কিছু বোঝাতে চায়। কিন্তু দেখতে পায় না, বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না। কেউ কিছু বললেও সে শুনতে পায় না। অন্তিম দিনে ভয়ঙ্কর বিকট চেহারার যমদূতেরা এসে তাকে

প্রবল পীড়া দান করে। সে যমদূতদেরকে দেখলেও অন্য কেউ তাদেরকে দেখতে পায় না বা তাদেরকে কোন বাধা প্রদানের চেষ্টা করে না। সম্পূর্ণ একাকী অসহায় অবস্থায় নিপীড়িত হয়ে যমদূতদের সঙ্গে নরক গ্রহে সে উপনীত হয়। সেখানে গিয়ে নানা দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ প্রচণ্ড যাতনা ভোগ করবার জন্য যাতনা শরীর প্রাপ্ত হয়।

কেবল নরকে যে দুঃখ আছে তা নয়। যদি তার পুণ্য কর্ম ফলে স্বর্গ গ্রহে উপনীত হওয়ার সুযোগ লাভও হয় সেখানেও পতন ভয় আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি। অর্থাৎ সঞ্চিত পুণ্যের ফলে বহুবিধ স্বর্গীয় সুখ ভোগ করার পর পুণ্য ক্ষীণ হয়ে এলে পুনরায় পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার জন্ম নিতে হয়। নরক গ্রহে যাতনা ভোগের পর পাপীর পাপ ক্ষীণ হয়ে এলে পুনরায় তাকে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়।

কেউ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে, কেউ জন্মগ্রহণ কালে, কেউ বাল্যকালে, কেউ যৌবনে, কেউবা প্রৌঢ় বয়সে, কেউ বা বৃদ্ধ বয়সে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

সংসারে জীব সুখ-সম্পদ লাভের জন্য বহু রকমের প্রয়াস করে থাকে। কিন্তু অর্থের নাশে, অর্জনে এবং পালনে নানা রকমের দুঃখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে যে পদার্থ মানুষের প্রীতিকর বলে বোধ হয় সেই সমস্তই পরিণামে দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধন ইত্যাদি দ্বারা মানুষের যত পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তার অপেক্ষা সুখের ভাগ অত্যন্ত অল্প।

অনবরত এই গর্ভ, জন্ম, জরা ইত্যাদি অবস্থাতে আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখের একমাত্র সনাতন ঔষধ হল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্ম আশ্রয় করা। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, তস্মাৎ তৎ প্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ—পণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্বদা ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করবেন।

বাসনা, কর্ম ও কর্মফল

সৃষ্টির সমস্ত ইতর প্রাণীদের কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার নেই। তারা প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন নীতি অনুসারে উন্নত শরীর লাভ করে থাকে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার রয়েছে। তার ভাল-মন্দ কর্ম এবং বাসনা তাঁর ভাবী জীবনের সূচনা সৃষ্টি করে।

মানুষকে বলা হয় বিবেকসম্পন্ন জীব, অর্থাৎ তার মধ্যে ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ভগবান দিয়েছেন। এই সৃষ্টির জগতে বেশীক্ষণ না থেকে সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠজগতে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, কিংবা, ব্রহ্মাণ্ড জগতের কোনও গ্রহলোক কিংবা পৃথিবীর মধ্যেই, এমনকি বর্তমান যে পরিবারে আছে যে গৃহে আছে সেই গৃহেও অন্য কোনও দেহ ধারণ করে থাকতে পারে। বৈকুণ্ঠজগতে যদি যাওয়া যায় তবে সেখানে এই রকম জড়দেহ ধারণ করতে হয় না, সচ্চিদানন্দময় দেহ ধারণ করা হয়।

মূলতঃ আমাদের চেতনা, কামনাবাসনা এবং আমাদের কর্ম আমাদের ভাবী জীবন নির্ধারিত করে যে, আমরা কি জীবন লাভ করব। কোনও কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি জাতিস্মর হয়ে তার পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই বিস্মৃতিতে বিরাজমান। তাই আমাদের বর্তমান শরীরে থাকার মেয়াদ শেষ হলেই অন্য কোনও জীবনে বিধির নিয়মে উপনীত হতে হবে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

> যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত ॥

অন্তিমকালে যে যে-বিষয় চিন্তা করে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাব-অনুসারী দেহধারণ করে থাকে।

চেতনা, বাসনা, কর্ম-দ্বারা কিভাবে আমাদের পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয় বিধির বিধান অনুসারে, সেই বিষয়ে মহাজনেরা কোনও কোনও দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যেমন—

কেউ যদি উলঙ্গভাবে নিজের চেহারা দেখাতে চেষ্টা করে, তবে পরবর্তীতে বৃক্ষশরীর লাভ হয়। কেউ যদি অনেক ঘুমাতেই চায় তাহলে সে ভালুক-শরীর লাভ করবে। কেউ যদি আমিষাশী হয় তবে পরবর্তী জন্মে আমিষাশী পশুপাখী জন্ম লাভ করবে। এগুলি কামনা বাসনার বিষয়।

কারও অঙ্গহানি করলে নিজের অঙ্গহানি হয়, কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে পরজন্মে তাকে হত হতে হয়, কাউকে প্রতারণা করলে নিজে প্রতারিত হতে হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করলে পরবর্তীতে বস্ত্রর অধিক গুণে প্রাপ্তি হয়। এগুলি কর্মের ফল। এই কার্যকারণ সূত্র আমরা সহজে দেখতে পাই না, তাই সাধারণের অগোচরে বলে 'অদৃষ্ট' নামে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু কার্যকারণ সূত্র স্বীকার করতেই হয়।

বিদেশে শ্রীল প্রভুপাদ একটি গাছকে দেখেছিলেন, সূর্যালোকের দিকে গাছের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই গাছের শাখা প্রশাখা গৃহের অভিমুখে প্রসারিত ছিল। তিনি বলেছিলেন, সেই গৃহসৌধটি যে নির্মাণ করেছিল সে অত্যন্ত আশা করেছিল সৌধমধ্যে থেকে সুখীজীবন যাপন করবে। কিন্তু অকালেই মানবজীবন হারিয়ে সে বৃক্ষশরীর পেয়েছে এবং সেই সম্পদ আগলে রেখেছে। ভারতবর্ষের এক প্রধানমন্ত্রী যিনি সুইজারল্যাণ্ডের পোষা কুকুর-শরীর লাভ করে দিন যাপন করছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ঐশী দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন।

কেউ হয়তো রাজসিংহাসনে নিষ্কণ্টকভাবে সারাজীবন থাকতে চায়। রাজপদ বা মন্ত্রীপদ ত্যাগ করতে চায় না। তাঁর বাসনা সেভাবে একান্ত যদি হয়, কিন্তু কর্মটা যদি রাজা বা মন্ত্রীর মতো না হয়ে ইতর প্রাণীর মতো হয়, তবে পরজন্মে সর্ববাঞ্ছাপূরণকারী শ্রীভগবান তাঁকে তার অবশ্যই অভীষ্ট আসনে রাখবেন। অর্থাৎ সেই সিংহাসনে সে সারাজীবন নিষ্কণ্টক নিঃশত্রুরূপে থাকবার সুযোগ পাবে, কিন্তু কর্মফল অনুসারে মানুষ-জন্ম

না পেয়ে ছারপোকা হয়ে আসনের গদিতে সারাজীবন থাকবে। বাসনা পূর্ণ করতে কল্পতরু ভগবান কখনও কার্পণ্য করবেন না। বাসনা পূর্ণ হবেই। কিন্তু কবে এবং কিভাবে হবে—সেটি ভগবানের হাতে। এ এক দারুণ রহস্য বটে। কেউ যদি নারদমুনির মতো সারা দুনিয়ায় যেখানে-খুশি-সেখানে ইচ্ছামতো যেতে বাসনা করে, কিন্তু নারদমুনির মতো তার স্বভাব না হয়ে যদি ইতরতর কোনও প্রাণীর মতো হয়ে থাকে, তবে তার বাসনা ও কর্ম অনুসারে হয়তো সে একটি মশার দেহ লাভ করে যেখানে-যখন-খুশি চলে যেতে পারবে আনন্দে। কোনও প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি অন্য কোনও দরিদ্র নিরীহ ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করে তার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে, পরবর্তী ঘটনাতে দেখা যাবে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিটি দেহত্যাগ করে প্রবঞ্চকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করল। সিন্দুকে প্রচুর টাকা জমা রেখে সেখানে একটি দেয়ালী পোকারূপে ধনী ব্যক্তিটি অবস্থান করতে লাগল। এক সাধু একজন লোককে বলেছিল, তুমি মাছ খেও না, তোমার শরীর-মন ভাল থাকবে। কিন্তু সেই লোকটি তার মৎস্যভোজী ঠাকুর্দার নির্দেশে সাধুর কথা অগ্রাহ্য করেছিল। ঠাকুর্দা মৃত্যুকালে মাছের চিন্তা করতে করতে পরজন্মে মৎস-শরীরে জন্ম নিয়ে পুকুরে বাস করছিল, লোকটি সেই পুকুরে মাছ ধরে এনে তার স্ত্রীকে রান্না করতে বলল। অদৃষ্ট কর্মফল-রহস্য এমনই যে, কে কাকে ধরছে, কে কাকে খাচ্ছে, তা বুঝে ওঠা মুশকিল।

কংস তার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, দশ-পনেরো দিনের মধ্যে গোকুলসহ আশেপাশের গ্রামের কোনও নবজাত শিশুসন্তান থাকলে তাকে অবশ্যই বধ করতে হবে। কেননা দৈববাণীতে কংস শুনেছিল যে, তাকে যে বধ করবে, তার জন্ম হয়েছে। সিপাহীরা বহু শিশুকে বধ করল। কিন্তু বলা হয়েছে, সেই নবজাত শিশুরা কংসেরই লোক, কৃষ্ণের অনুকূলের লোক ছিল না। তারা আগের জন্মে অভিশপ্ত ছিল কংসের দ্বারাই তারা নিহত হবে। সিপাহী পাঠিয়ে কংস

যাদেরকে শত্রু মনে করে বধ করতে লেগে পড়েছে, তারা কংসেরই লোক ছিল। এভাবে গোকুলের আশেপাশে তারা শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই দর্শনটি সাধারণের অগোচর।

লোকে দীর্ঘ আয়ু কামনা করতে পারে। দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারে। কিন্তু কর্মদোষে খোঁড়া বা কাণা হয়ে থাকলো। সেক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু পেয়েও কোনও লাভ নেই। পুত্রহীন পিতামাতা পুত্র কামনা করতে পারে, পুত্র লাভ করতে পারে। কিন্তু পুত্র এমন দুষ্ট হল যে, পিতামাতা সেই পুত্রকে আর দর্শন করতে চায় না। লোকে লটারী খেলে লাখপতি হতে পারে, তাতে তার আনন্দ হতে পারে। কিন্তু শত্রু এসে তার গলা কেটে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এসমস্ত কর্মফল অদৃষ্ট বটে। আমাদের সুখ-দুঃখ ভোগ প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—

ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

বিধির বিধান অনুসারে এই চরাচরে আমাদের কর্মফলে যতটুকু বরাদ্দ ততটুকুই ভোগ করতে পারব, তার একটুও কম বা বেশী নয়। যতটুকু সুখ বা দুঃখ পাওয়ার কথা ততটুকুই অবশ্যই পেতে হবে। কখনও তার বেশী কিছু আশা করা যাবে না।

সৃষ্টি রহস্যের এরকম কার্যকারণসূত্রে—এরকম কর্মবাসনা-কর্মবন্ধনে যদি আবদ্ধ হতে না চাই, অর্থাৎ মুক্ত হতে চাই, তা হলে আমাদের মনুষ্য জীবনের আয়ুষ্কালের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কৃষ্ণভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মানি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

'ইন্দ্রগোপ'-নাম ক্ষুদ্রকীট হোক, কিংবা দেবতাদের রাজা ইন্দ্রই হোক, কর্মমার্গই জীবদেরকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হয়ে তাদের নিজ নিজ কর্ম-বন্ধ-অনুরূপ ফলভাজন করছেন, অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর প্রতি ভক্তিমানগণের সমস্ত কর্মবন্ধন সমূলে দহন করছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভক্তিমান ব্যক্তি এই জড়জগতের কোনকিছু কামনা করে না। যা কিছু সে পায়, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা উপযোগ করার জন্যই যত্ন করে। শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের ভক্তি অনুশীলন তৎপর লোকের কর্ম, কর্মবাসনা, অবিদ্যা বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে থাকেন।

পাপীরা নরকে যায়

বিবর্তনক্রমে জীবাত্মা মানবজন্ম পায়। মানবজন্মেই বিবেক-বুদ্ধি পাওয়া যায়। ভগবান মানুষকে ভালমন্দ বিচারবোধ দান করে থাকেন। মানুষ তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে কর্মক্ষেত্রে সদাচার বা কদাচার করতে থাকে। মানুষের সমস্ত কর্মের সাক্ষী চৌদ্দ জনের নাম মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ রয়েছে। যথা—(১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) বায়ু, (৪) অগ্নি, (৫) আকাশ, (৬) পৃথিবী, (৭) জল, (৮) দিবা, (৯) নিশা, (১০) ঊষা, (১১) সন্ধ্যা, (১২) ধর্ম, (১৩) কাল, (১৪) পরমাত্মা।

সারা বিশ্বে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আমরা অনেক কিছু পাপকর্ম করতে পারি, কিন্তু এসকল দেবতাদের কাউকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আবার আমাদের বহু সৎ কর্মের হিসাব এই বিশ্বে কেউ না রাখলেও উনারা সাক্ষী থাকেন। এমনকি সমস্ত দেবতাকেও যদি কখনও সম্ভব হয়ে থাকে, কোন কিছু তাদের আড়ালে থাকার বা করার মতো, তবুও কাল কিংবা সর্বোপরি পরমাত্মাকে আড়াল করে কোনও কিছু করা সম্ভব নয়।

মানুষের সমস্ত পাপ-পুণ্যের হিসাবরক্ষক হচ্ছেন শ্রীচিত্রগুপ্ত। তিনি শ্রীযমরাজের কর্মসচিব।

পাপ তিন প্রকার। যথা—

(১) **শারীরিক পাপ** ঃ পরহিংসা, চুরি, পরস্ত্রী সঙ্গ।

(২) **বাচিক পাপ** ঃ অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, পরদোষ কীর্তন, মিথ্যা ভাষণ।

(৩) **মানসিক পাপ** ঃ পরের দ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা, বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা।

এই ত্রিবিধ পাপ সযত্নে এড়িয়ে চললে মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হতে পারে। শ্রীভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১৩ অধ্যায়)

পাপাচারী মানুষ যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখন যমদূতেরা তার সূক্ষ্ম দেহকে পাশবদ্ধ করে যমপুরীতে নিয়ে যায়। পৃথিবী থেকে যমপুরী অর্থাৎ

নরক গ্রহের দূরত্ব হচ্ছে ৮৬ হাজার যোজন বা ৭ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল। অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার কিলোমিটার। মহাভারতে বলা হয়েছে, ষড়শীতি-সহস্রযোজন-বিস্তীর্ণ-মার্গ। নরক গ্রহের অবস্থানটি হচ্ছে পাতাললোক ও গর্ভোদক সমুদ্রের মধ্যবর্তী। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতি দ্রুত গতিতে যমদূতেরা পাপাত্মাকে সেই স্থানে নিয়ে যায়।

নরকের যমপুরীর নাম হচ্ছে সংযমনী। শ্রীসূর্যদেবের পুত্র ধর্মরাজ যম হচ্ছেন নরকের অধিপতি।

শতসহস্র নরককুণ্ড বা শাস্তিবিভাগ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে মাত্র ২৮টি নরককুণ্ডের বর্ণনা করেছেন, যা শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/২৬/৫-৩৬) বর্ণিত হয়েছে। যাতনা শরীর নামক এক প্রকার শরীর ধারণ করে পাপাত্মারা সেখানে বহু সহস্র বৎসর অবধিও নরক-যাতনা ভোগ করে। যাতনা শরীরটির বৈশিষ্ট্য হল বহু রকমের নিপীড়ণ করা হলেও শরীর ত্যাগ হবে না। কেবল যাতনাই পেতে থাকবে।

পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি কি ধরনের পাপাচার করলে নরকের কোন্ কুণ্ডে কিভাবে শাস্তি ভোগ করে, তা শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন।

(১) তামিস্র ঃ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পরধন, পরস্ত্রী-পুত্র অপহরণ করে, তাকে এই কুণ্ডে শাস্তি ভোগ করার জন্য আনা হয়। নিরম্বু উপবাস রেখে তার উপর প্রচণ্ড প্রহার দেওয়া হয়। পাপী প্রহার খেয়ে খেয়ে মূর্ছিত প্রায় হয়ে পড়ে।

(২) অন্ধ তামিস্র ঃ যে পরস্ত্রী উপভোগ করেছিল, তাকে এই কুণ্ডে যমদূতেরা এমনভাবে প্রহার দিতে থাকে যে তার বুদ্ধি ও দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) রৌরব ঃ প্রাণী হত্যাকারী এই শাস্তি বিভাগে পতিত হয়। এখানে হিংসিত জীবেরা অর্থাৎ পাপী যাদেরকে হত্যা করেছিল তারাই রুরু নামে এক ভয়ংকর জন্তু রূপে জন্ম নিয়ে পাপীকে পীড়া দিতে থাকে।

(৪) **মহা রৌরব** ঃ যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিয়ে জীবনযাপন করে, ক্রোব্যাদ নামক রুরু তাকে অশেষ যাতনা দিয়ে তার মাংস খেতে থাকে।

(৫) **কুম্ভীপাক** ঃ যে ব্যক্তি পশু পাখী রান্না করেছিল, তাকে এখানে ফুটন্ত তেলের মধ্যে যমদূতেরা পাক করে থাকে।

(৬) **কালসূত্র** ঃ ব্রহ্ম-ঘাতক পাপী এখানে পতিত হয়। বিস্তীর্ণ উত্তপ্ত তামার মেঝেতে প্রচণ্ড সূর্যতাপের মধ্যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পাপী অবস্থান করে।

(৭) **অসিপত্র বন** ঃ যারা নাস্তিক পাষণ্ডী তারা এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে। যমদূতেরা পাপীকে বেত্রাঘাত দিয়ে পীড়ন করে। পাপী বনের মধ্যে দৌড়াতে থাকে। তীক্ষ্ণধার পাতাগুলিতে তার সর্বাঙ্গ কেটে কেটে যায়।

(৮) **সূকর মুখ** ঃ কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি অদণ্ডণীয় বা নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে তাকে এখানে আসতে হয়। যমদূতেরা বিশাল এক যাঁতাকলে তার হাড়গোড় পিষাতে থাকে।

(৯) **অন্ধকূপ** ঃ যে ব্যক্তি কীট পতঙ্গকে হত্যা করে তাকে এই অন্ধকূপে আসতে হয়। কুঁয়োর মধ্যে তাকে অসংখ্য কীট দংশন করতে থাকে। জ্বালায় অস্থির হয়ে পাপী ছটফট করতে থাকে।

(১০) **কৃমিভোজন** ঃ যে ব্যক্তি অতিথি, বালক, বৃদ্ধদের না ভোজন করিয়ে নিজে ভোজন করে তাকে এই কুণ্ডে কৃমি হয়ে অন্য কৃমিকে খেতে হয় এবং অন্য কৃমিরা তাকে খেতে থাকে।

(১১) **সন্দংশ** ঃ বলপ্রয়োগ করে সৎ ব্যক্তির ধন যে হরণ করে তাকে এখানে আসতে হয়। যমদূতেরা উত্তপ্ত কাঁচি ও সাড়াশি দিয়ে তার পেটের নাড়ি বের করে।

(১২) **তপ্ত শূর্মী** ঃ যে পুরুষ বা নারী অগম্য গমন করে, তাকে যমদূতেরা এখানে জ্বলন্ত লৌহময় মূর্তিকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করায়।

(১৩) **বজ্রকণ্টক শাল্মলী** ঃ যে ব্যক্তি কামান্ধ হয়ে পশুগমন করে তাকে এখানে ভয়ঙ্কর কাঁটাময় শিমুল গাছে চড়িয়ে টানা হেঁচড়া করা হয়।

(১৪) **বৈতরণী** ঃ দায়িত্বশীল পরিবারে জন্ম নিয়েও যে ব্যক্তি ধর্মনীতি অবজ্ঞা করে তাকে এই পুঁজ-রক্ত-বমি-নখ পূর্ণ নদীতে হাবুডুবু খেতে হয়।

(১৫) **পূয়োদ** ঃ যে ব্যক্তি নিয়মবিহীন ভাবে যৌন জীবন যাপন করে, তাকে এই নোংরা সমুদ্রে কফ-থুতু-পুঁজ-মূত্র খেতে হয়।

(১৬) **প্রাণরোধ** ঃ উচ্চবর্ণের মানুষেরা পশুপাখি পালন ও হত্যা করলে এই কুণ্ডে বাণবিদ্ধ অবস্থায় তাদেরকে নোংরা খেতে হয়।

(১৭) **বিশসন** ঃ যে ব্যক্তি দম্ভ করে যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে এই নরকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বলি দেওয়া হয়।

(১৮) **লালাভক্ষ** ঃ যে বদ স্বভাব ব্যক্তি পত্নীকে বশে আনতে শুক্র পান করায় তাকে এই শুক্র নদীতে ডুবিয়ে জোর করে শুক্র পান করানো হয়।

(১৯) **সারমেয়াদন** ঃ যে ব্যক্তি পরগৃহে অগ্নি দান করে, করের নামে লুণ্ঠন করে, বিষ দান করে, তাকে এই নরকে আসতে হয়। এখানে ৭২০টি বজ্রদংষ্ট্রা কুকুর সেই পাপীকে জ্যান্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে।

(২০) **অবীচি** ঃ যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে সাক্ষ্য দানে মিথ্যা কথা বলে তাকে এখানে এনে সুউচ্চ পর্বত থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং নিচে পাথরের মধ্যে পড়ে পাপীর শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

(২১) **অয়ঃপান** ঃ উচ্চবর্ণের ব্যক্তি যদি সুরাপান করে তাকে এখানে যমদূতেরা পা দিয়ে তার বুক চেপে ধরে তপ্ত তরল লোহা পান করায়।

(২২) **ক্ষারকর্দম** ঃ যে ব্যক্তি 'আমি উন্নত' এরূপ আত্মগরিমা করে এবং অন্যে অসম্মান করে তাকে এখানে নির্যাতিত হয়ে ক্ষার ও কর্দমের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয়।

(২৩) **রক্ষোভোজন** ঃ যে ব্যক্তি কালীর কাছে নরবলি বা পশুবলি দিয়ে মাংস খায়, তাকে এই নরকে পতিত হতে হয়। এখানে হিংসিত

অর্থাৎ যাকে বলি দেওয়া হয়েছিল সে রাক্ষস হয়ে মহানন্দে পাপীর মাংস খেতে থাকে।

(২৪) **শূলপ্রোত** ঃ যে ব্যক্তি পশুপাখিকে আশ্রয় দেয়, যত্ন করে, আবার পশুপাখিকে বিদ্ধ করে খেলা করে এবং যন্ত্রণা দিয়ে মারে তাকে এখানে আসতে হয়। এই নরকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত সেই পাপীকে বক-শকুনেরা ছিড়ে ছিড়ে খেতে থাকে।

(২৫) **অবট নিরোধন** ঃ যে ব্যক্তি কাউকে কূপে, গোলায়, গুহায় বদ্ধ রেখে কষ্ট দেয়, তাকে এখানে বিষাক্ত ধোঁয়া ও আগুনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছটফট করতে হয়।

(২৬) **দন্দশূক** ঃ যে ব্যক্তি সাপের মতো ক্রোধ দেখিয়ে কোন প্রাণীকে যন্ত্রণা দেয় তাকে এখানে পঞ্চমুখ-সপ্তমুখ সাপেরা যাতনা দিয়ে গ্রাস করতে থাকে।

(২৭) **পর্যাবর্তন** ঃ যে ব্যক্তি অতিথিকে দেখলেই ক্রুদ্ধ হয়, এই নরকে শকুন-বক চঞ্চু দিয়ে তার চোখ উৎপাটন করতে থাকে।

(২৮) **সূচীমুখ** ঃ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কেউ যদি চোর মনে করে সন্দেহ করে তবে তাকে এই নরকে পতিত হতে হয়। এখানে যমদূতেরা কাঁথা সেলাইয়ের মতো লোহার সূত্র দিয়ে তার শরীর বয়ন করে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

ভগবদ্ ধাম

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত হয়েছে—সর্ব উৎকৃষ্ট কৃষ্ণধাম গোকুল। গোকুল চিন্ময় সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মের মতো। সেই পদ্মের কর্ণিকা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাস স্থান। সেই কর্ণিকা ষট্ কোণ বিশিষ্ট। সেই পদ্মের কেশর বা পাপড়িগুলি কৃষ্ণের অংশস্বরূপ পরমপ্রেমভক্ত সজাতীয় গোপদিগের আবাসভূমি। সেই আবাসভূমি সমূহ প্রাচীরের মতো শোভিত। সেই পদ্মের বিস্তৃত পত্র বা দলগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবন স্বরূপ ধাম বিশেষ।

গোকুলের বহির্ভাগে চারিদিকে শ্বেতদ্বীপ নামে অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ চারিখণ্ডে চারিদিকে বিভক্ত। এক একভাগে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ধাম রয়েছে। সেই বিভক্ত চারি ধাম চারি পুরুষার্থ-ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং সেই সেই পুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মক ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদের দ্বারা আবৃত। শ্বেত দ্বীপ অষ্টদিক ও ঊর্ধ্ব-অধোদিক ক্রমে দশটি শূল নিবদ্ধ আছে। অষ্টদিক—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল এই আটটি রত্ন দ্বারা শোভিত। মন্ত্ররূপী দশ দিকপাল দশদিকে বর্তমান। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ পার্ষদবৃন্দ এবং বিমলা প্রভৃতি শক্তিবৃন্দ সর্বদিকে শোভা পাচ্ছেন।

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণি দিয়ে গঠিত গৃহগুলিতে সুরভি ধেনুদের পালন করছেন শ্রীকৃষ্ণ।

এই গোকুল বা গোলোকধামের অবস্থান সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—প্রথমে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম, তার উপরে মহেশ বা শিবধাম, তার উপরে হরিধাম বা বৈকুণ্ঠ ধাম এবং সর্বোপরি গোলোক নামে শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম।

সেই গোলোকধামের আরও বর্ণনা রয়েছে—সেখানে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা। পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত। সমস্ত বৃক্ষ মাত্রই চিন্ময় কল্পতরু। ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণি বিশেষ, জলমাত্রই অমৃত,

কথা-মাত্রই গান, গমন মাত্রই নাট্য, শ্রীকৃষ্ণের বংশী—প্রিয়সখী, সেখানের আলো হলো দিব্য জ্যোতি—চিদানন্দময়, পরম চিন্ময় পদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা উপভোগ্য। সেখানে কোটি কোটি সুরভী গাভী থেকে চিন্ময় মহা ক্ষীর সমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হচ্ছে। সেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল বলতে কোনও খণ্ড কাল অনুপস্থিত। সব সময় নিত্য বর্তমান কাল। সেই ধামকে এই জড়জগতের বিরলচর অতি অল্প সংখ্যক সাধু ব্যক্তিই গোলোক বলে জানেন।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত হয়েছে—পৃথিবীতে মথুরা-বৃন্দাবন ধাম, প্রয়াগে মাধবধাম, নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথধাম রয়েছে। স্বর্গে বামনরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর ধাম রয়েছে। সকাম পুণ্যকর্মা গৃহীদের সেটি ভোগস্থান। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক যখন প্রলয় হয়ে যায়, তখন তার ঊর্ধ্বে মহর্লোক নষ্ট হয় না। সেখানে আসন্ন মুক্তি-অধিকারী ব্যক্তিরা থাকেন। কতকগুলি বৈদিক আচার পালনের ফলে ব্রাহ্মণত্ব ও মহর্ষিত্ব লাভ হয় এবং সেখানে উপনীত হওয়া যায়। ভৃগু প্রমুখ হাজার হাজার ভক্তিপর মহর্ষিরা সেখানে মহা মহা যজ্ঞ বিস্তার করে থাকেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে ভগবান যজ্ঞেশ্বর কোটি সূর্যের মতো তেজ ও সুবিশাল অঙ্গকান্তি ধারণ করে বাহু প্রসারণ করে যাজকদেরকে ইষ্টবর প্রদান করেন। তারপর যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হন।

সহস্র চতুর্যুগ প্রমাণ এক ব্রহ্মা দিনের অবসানে নিম্ন ত্রিলোক দগ্ধিভূত হয়। সেই উত্তাপে মহর্লোকেও তাপিত হয়। তখন ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ মহর্লোকের রাত্রি জেনে তাপ ভয়ে উপরিস্থিত জনলোকে চলে যান। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সেখানে শ্রীযজ্ঞেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না।

মহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই একই রকম। উপকুর্বান ব্রহ্মচারীদের ভোগ স্থান এই দুই গ্রহলোক। মহর্লোকের মতো জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায়। তার উপরে তপোলোক। সেখানে বাস করেন

মহত্তম, আত্মারাম ও আপ্তকাম ব্যক্তিরা, সনক সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার এই বৃহদ্ ব্রত ব্রহ্মচারীরা, কবি হবি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন প্রভৃতি নব যোগেন্দ্রও।

পৃথিবীর কেবলমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত ফলে এই তপোলোকে উন্নীত হওয়া যায়। মহর্লোকের প্রলয়-উত্তাপ এবং সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। জনলোকে যদিও প্রলয়-উত্তাপ নেই, তবুও ত্রিলোক দাহরূপ অমঙ্গল দর্শন করতে হয়। কিন্তু তপোলোকে সর্বদাই মঙ্গল। নিম্ন ভুবনগুলিতে প্রাজাপত্য পদ লাভ করে যত সুখ পাওয়া যায়, তার চেয়ে কোটিগুণ সুখ লাভ হয় এই তপোলোকে। ভৃগুআদি মহর্ষিবৃন্দ তপোলোকের অধিবাসীদেরকে পূজা করে থাকেন। তপোলোকের অধিবাসীরা ধ্যান নিষ্ঠ থাকেন। তাদের খাটাখাটনি নেই। তাঁরা পূর্ণকাম। তাঁদের অভাব বোধ নেই। লোকে সিদ্ধিলাভের জন্য আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তপোলোকের অধিবাসীদের কাছে অনিমা প্রভৃতি সিদ্ধিগণ মূর্তিমতী হয়ে তাঁদের উপাসনা করছেন। সেখানকার অধিবাসীরা সমাধিস্থ হয়ে হৃদনয়নে ভগবানকে দর্শন করেন। বানপ্রস্থীগণও এই তপোলোকে ভোগ লাভ করেন।

তপোলোকের ঊর্ধ্বে সত্যলোক। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি শত জন্ম শুদ্ধভাবে স্বধর্ম পালন করেছেন, তিনি এই সত্যলোক লাভ করেন। সত্যলোকটিতে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করে। সেখানে সহস্রশীর্ষা নামে শ্রীহরি সর্বদা অবস্থান করছেন। শ্রীব্রহ্মা তাঁর আরাধনা করেন। সহস্র মস্তক, সহস্র ভুজ ও পদ, নীলমেঘবর্ণ অঙ্গ ভগবান সহস্রশীর্ষা শেষনাগের শয্যাতে শয়ান আছেন। লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন, গরুড় কৃতাঞ্জলী হয়ে আছেন। নারদ নৃত্যগীত দ্বারা প্রণয়ভক্তি জ্ঞাপন করছে। ব্রহ্মা সেই শ্রীহরির অর্চনের পর উপবেশন করলে ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মাকে স্বভক্তিমার্গ উপদেশ করেন। এই সত্যলোক সন্ন্যাসীগণের ভোগস্থান।

তার পরে ব্রহ্মাণ্ডের পরিসীমা রয়েছে। পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত পুরু আবরণী রয়েছে। এই আবরণীটি পর পর আটটি আবরণ দ্বারা গঠিত। যথাক্রমে মাটি আবরণ, জল আবরণ, আগুন আবরণ, বায়ু আবরণ, আকাশ আবরণ, অহংকার আবরণ, মহত্তত্ত্ব আবরণ এবং মহা তমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণ। ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে পর পর এই আবরণগুলির প্রথমটির তুলনায় পরেরটি দশগুণ বেশী পুরু।

প্রতি আবরণীতে শ্রীভগবান বিভিন্ন রূপে পূজিত হচ্ছেন। ক্ষিতি বা মাটি আবরণীতে বরাহরূপী ভগবান বিরাজমান। ধরিত্রীদেবী ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ উপচার দ্বারা তাঁর অর্চনা করছেন। জল আবরণে মৎসদেব পূজিত হচ্ছেন, অগ্নি আবরণে সূর্যদেব, বায়ু আবরণে প্রদ্যুম্নদেব, আকাশ আবরণে অনিরুদ্ধদেব, অহংকার আবরণে সঙ্কর্ষণদেব, মহত্তত্ত্ব আবরণে বাসুদেব পূজিত হচ্ছেন।

পূর্ব পূর্ববর্তী নিজ নিজ কার্য থেকে উত্তরোত্তরবর্তী কারণসমূহ পূজ্য-পূজক, ভোগ্য-শ্রী-মহত্ত্ব বিষয়ে ক্রমশঃ অধিক।

মহাতমোময় আবরণে নিবিড় শ্যামকান্তি প্রকৃতিদেবী মায়ামোহিনী মূর্তির সৌন্দর্যম্লানকারী চমৎকার মূর্তি বিরাজিত। তিনি দ্বাররক্ষিকা। তিনি বিষ্ণু দাসী।

সেই দুরন্ত ঘনতমো অতিক্রম করলে কোটিসূর্যতুল্য তেজস্বী পরমেশ্বরের তেজোময় স্থান বিরাজমান। সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম পরমাণু সমুহে পরিব্যাপ্ত সূর্য যেমন শোভিত হয়, সেরূপ বিভিন্ন মহাসিদ্ধ বা সংসিদ্ধ জীবেদের কর্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হচ্ছেন। কিন্তু সেই মুক্তিপদে ভগবানের কোনও সেবা নেই। ভগবান নিরাকার রূপে বিরাজ করেন। জীবও সেরকম সেই জ্যোতিতে লীন হয়ে বাস করে। সেই ব্রহ্মজ্যোতি লোকের ঊর্ধ্বে শিবলোক। সেখানে পরম বৈষ্ণব শ্রীশিব প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করেন।

মনোরম শিবধামের ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ ধাম। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকেন। প্রেমভক্তগণেরই এই ধাম সুলভ। যারা অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়ার বাসনা করে তারা এই স্থানের অস্তিত্বই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ভৃগু, ব্রহ্মা, শিবও এই ধাম প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন।

পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি যদি নিষ্কামভাবে বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্মে নিষ্ঠা লাভ করে, তবে শ্রীহরির বিশেষ কৃপাগুণে সেই ব্যক্তি সত্যলোকে আসতে পারে। তার শত গুণ কৃপা ফলে কেউ শিবধামে আসতে পারে, সেই কৃপার শতগুণ হরিকৃপা হলে বৈকুণ্ঠগতি লাভ করে।

জড়জগতের দুঃখতাপে ক্লিষ্ট হয়ে যে ব্যক্তির হৃদয় শুষ্ক হয়েছে, যাদের অন্তরে সার-অসার বিবেক নেই, সেই রকমের অসার গ্রাহী সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়। তাদের সেই মুক্তিকে বলে সাযুজ্যপদ প্রাপ্তি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী। শ্রীকৃষ্ণ সেই অপরাধীদের কাছে নিজ প্রেমভক্তি গোপন করবার জন্য শিবের অবতার শংকরাচার্যকে মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্রে তাদের রুচি জন্মিয়ে সাযুজ্য প্রাপ্তির জন্য লালায়িত করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধিতা করে যুদ্ধে নিহত অসুরেরাও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে। শ্রীচৈতন্য সমকালীন বিখ্যাত ন্যায় পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'মুক্তি' কথাটিই উচ্চারণ করতে পছন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা 'কৃষ্ণভক্তি' চাইতেন।

কৃষ্ণভক্তিপ্রাণ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কেউ নববিধা ভক্তি যাজনপর হয়ে বৈকুণ্ঠজগতে উন্নীত হয়। নববিধা ভক্তির যে কোন একটি প্রেমসহকারে অনুষ্ঠান করলে হৃদয়ের রোগ দূর হয়, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি-বিরোধী নানারকমের ফললাভের অভিলাষ নষ্ট হয়ে যায় এবং শ্রীহরি পাদপদ্মে প্রেম উদিত হয়ে থাকে। তবুও রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচিত্র ভক্তিরস মাধুর্যের লোভে নববিধাভক্তিই সানন্দে অনুষ্ঠান করে চলেন।

যাদের হৃদয়ে রোগ আছে, তারা নানারকম জড় বৈভব কামনা করতে থাকে। সেই কামনা থেকে বিভিন্ন রকমের চিন্তাজ্বর উপস্থিত হয়। এমনকি কামনার ফল যদি ভোগও হয়, তবুও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি বিষয়ে তার মহা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কি ইহলোক, কি পরলোক—উভয় ইন্দ্রিয়-সুখকামনাই অনর্থজনক। কামপূর্ণ হৃদয় মানেই তা রোগগ্রস্ত। প্রেমপূর্ণ হৃদয় মানে বিশুদ্ধ। প্রেম উদ্‌গম হলে কামনা লীন হয়। তখন পরমসুখ লাভের পন্থা আসে। প্রেমভক্তি যে যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ। সেই সেই স্থানে শ্রীহরি বিরাজ করেন।

অবশ্য জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও, বৈকুণ্ঠের মতো প্রেমপূর্ণ ভক্তি নেই। কেননা বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত বাসিন্দাই ভক্তিনিষ্ঠ। বৈকুণ্ঠে কোনও বিঘ্ন নেই। অন্যত্র বহু রকমের ভক্তি বিঘ্ন থাকে। আমাদের পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত। কিন্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য প্রেমরসিক ভক্ত-সংসর্গ সহজে লাভ হয়।

ভূলোক থেকে গোলোক

বৃহৎভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী গোপকুমারের ভূলোক থেকে গোলোক অবধি বিভিন্ন গ্রহলোক দর্শনপ্রসঙ্গ আলোচনা শুনে আমরা ক্রম ঊর্ধ্বলোকসমূহের উৎকর্ষ বিষয়ে ধারণা করতে পারি।

আমি (গোপকুমার) ভৌম মথুরায় বিশ্রামঘাটে যমুনাস্নান করে বৃন্দাবনে গেলাম। গোবর্ধন পরিভ্রমণ ও দুধ পান করে জীবনধারণ করতে লাগলাম। পূর্ব বান্ধবদের অলক্ষিতে থাকতাম। ভজন মন্ত্র জপ করতাম। যমুনা তীর, ভাণ্ডীর বন, তালবন, গোকুল মহাবন প্রভৃতি স্থানে ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে লাগলাম। আমার বেশভূষা একটু অন্যরকম ছিল। তাই পূর্ব বন্ধুরা আমাকে চিনতে পারল না। শ্রীহরিকে দর্শন করবার জন্য আমার উৎকণ্ঠা জাগল। সেই উৎকণ্ঠায় সারা বন ও মথুরা মণ্ডল আমার দৃষ্টিতে শূন্যময় বোধ হতে লাগল।

তখন আমি শ্রীজগন্নাথের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে তাঁর দর্শন উদ্দেশ্যে উৎকল দেশ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে ধর্মাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দেখলাম। তাদের মুখে শুনতে পেলাম, এই মর্ত্যলোকের ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষে স্বর্গ নামে এক স্থান আছে, যেখানে দেবতারা বাস করেন। সেই স্বর্গ বিমানশ্রেণীতে সুশোভিত। সেই স্থান ভয়-দুঃখ বর্জিত, জরা-বার্ধক্য দোষশূন্য। সেখানে পরম সুখ।

আরও শুনলাম, স্বর্গ তিনটি—ভৌম স্বর্গ, বিল স্বর্গ ও দিব্য স্বর্গ। তার মধ্যে ভৌম স্বর্গের অন্তর্গত সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। আমাদের বাসভূমি হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ নয়টি বর্ষে বিভক্ত। তার মধ্যে একমাত্র 'ভারতবর্ষ' ছাড়া অন্য দ্বীপ ও বর্ষগুলি ভৌম স্বর্গ নামে অভিহিত। এই পৃথিবীর নীচের দিকে সাতটি স্তর আছে—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্ত পাতালকে বলা হয় বিল স্বর্গ। পৃথিবীর উপরের দিকে ভুবর্লোক। ভুবর্লোকে গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি অবস্থিত। এই ভূলোক থেকে ভুবর্লোক সূক্ষ্মতর বলে ভূলোককে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ভুবর্লোকের উপরে

দিব্য স্বর্গ। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতিপুত্ররূপে সেখানে বিরাজ করেন। তিনি ইন্দ্রের ভ্রাতারূপে জন্মলীলা প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি উপেন্দ্র নামে অভিহিত হন। সমস্ত দেবতা সেই জগদীশের স্তব করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনে সেই ভগবানের দর্শনের জন্যই আমার মন আকুল হল। তাঁর দর্শন সংকল্প করে তাঁকে স্মরণ করতে করতে নিজ ইষ্ট মন্ত্র জপতে লাগলাম। অতি অল্পকালের মধ্যে স্বর্গ থেকে বিমান এসে উপস্থিত হল। আমি আনন্দে সেই বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে গেলাম। পূর্বে গঙ্গাতটে রাজমন্দিরে যাঁর প্রতিমা দর্শন করেছিলাম, স্বর্গে এসে সেই শ্রীবিষ্ণুকে দেখলাম। কিন্তু মর্ত্যের সৌন্দর্য-মাধুর্য অপেক্ষা স্বর্গের সৌন্দর্য-মাধুর্য অধিক। দেখলাম, গরুড় স্কন্ধে ভগবান উপবিষ্ট আছেন। তাঁর সামনে শ্রীনারদমুনি গান করছেন আর ভগবান সেই গানের প্রশংসা করছেন। আমি শ্রীবিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ স্নিগ্ধবাক্যে বললেন, 'হে গোপনন্দন, এখানে এসে তুমি ভাল করেছো। তোমাকে আর দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে না। আমার বৈভব দেখে ভয় করো না। ভয়-সম্ভ্রম ছেড়ে কাছে এসো।' তারপর দেবতারা আমাকে নন্দকাননে বাস করালেন। আমি সেখানে দেবভোগ্য অমৃত ও দিব্য দ্রব্যসমূহ উপভোগ করে তৃপ্ত হলাম। আমার কোন ভয়, শোক, রোগ, গ্লানি, আর্তি, ভয়াদি ছিল না। স্বর্গের বিভূতিস্বরূপ পারিজাত ফুল প্রভৃতি দিব্য বস্তু দিয়ে ভগবান সেখানে অর্চিত হন। কিন্তু তিনি ইন্দ্রের ছোট ভাই উপেন্দ্র রূপে, ঈশ্বর ও শরণ্যভাবে অর্চিত হন। ভ্রাতৃত্ব হেতু স্নেহাতিশয়, ঈশ্বরত্ব হেতু গৌরবভাব, শরণত্ব হেতু আদরময় ভাববিশেষ দ্বারা তিনি অর্চিত হন। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, আহা! ইন্দ্র বড় ভাগ্যবান! যেহেতু শ্রীবিষ্ণু নিজহাতে অসুর সংহারে নিষ্কণ্টক করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য তাঁকে প্রদান করেছেন আর উনি দিব্য দিব্য উপহারসমূহ দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করছেন। ভগবানও তাঁর দেওয়া উপহারগুলি স্বয়ং করকমল প্রসারিত করে গ্রহণ করছেন। ভাবতে লাগলাম, আমিও

এভাবে ভগবানের অর্চনা করব। আর বিষ্ণুও কি আমাকে এভাবে কৃপা করবেন? এই সংকল্প করে আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে সেখানে বাস করতে লাগলাম।

একদিন সেখানে শ্রীবিষ্ণুকে দেখতে পেলাম না। দেবতারা বহু অন্বেষণ করেও তাঁর সন্ধান পেলেন না। আমি এর কারণ খুঁজে পেলাম না। তারপর বুঝতে পারলাম স্বর্গরাজ ইন্দ্র বলপূর্বক কোন এক মুনিপত্নীকে দূষিত করে শাপ ভয়ে ও লজ্জাবশত কোন গোপনীয় স্থানে লুকিয়ে গেছেন। বুঝলাম গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করতে ইন্দ্র গিয়েছিলেন। এখন তিনি মানসসরোবরে পদ্মনালের ভেতরে লুকিয়ে গেছেন। সেই সময় শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশে দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের জানালেন আমাকে যেন ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত করা হয়। বিষ্ণুর ইচ্ছা জেনে ইন্দ্রমাতা অদিতি এবং ইন্দ্রের সুহৃদগণ আনন্দ সহকারে তা অনুমোদন করলেন। আমি মা অদিতি, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী এবং বৃহস্পতি প্রমুখ ব্রাহ্মণদের সম্মানপূর্বক বিষ্ণুভক্তি প্রচার করেছিলাম। যদিও আমি স্বর্গরাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তবুও ইন্দ্রের রাজপুরীতে বাস না করে, আগের মতোই নন্দনকাননে বাস করতাম। যদিও আমি জপের ফলস্বরূপ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন ও স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তবুও মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিনি। কেননা যার প্রভাবে এত ফল লাভ হয় তাকে পরিত্যাগ করলে অকৃতজ্ঞতা দোষ হয়। কিন্তু নন্দনকাননে থেকেও আমি সর্বদা ব্রজের বিচ্ছেদ-দুঃখে দুঃখী ছিলাম। আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। তখন জগদীশ্বর বিষ্ণু আমার অবস্থা দেখে স্বয়ং হস্তকমল দিয়ে বারংবার আমার গা স্পর্শ করে ও বিচিত্র কথা শুনিয়ে আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতো মনে করে গৌরব প্রকাশ করতেন এবং আমার নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য সাদরে নিয়ে তিনি ভোজন করতেন। তাঁর করস্পর্শে ব্রজবিচ্ছেদ দুঃখ ভুলে যেতাম। আমার শুকনা ভাব ঘুচে যেত এবং আমি স্বাস্থ্য ফিরে পেতাম। কিন্তু আবার শ্রীবিষ্ণু কোথাও চলে যেতেন। স্বর্গলোকে তাঁকে সর্বদা

দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলাম, আর স্বর্গে থাকব না, পৃথিবীতে গিয়ে নীলাচলপতি জগন্নাথকে দর্শন করব। নীলাচলপতি স্থিরভাবে সর্বদা সেখানে রয়েছেন। স্বর্গে এরকম ভগবানের অন্তর্ধান আমার সহ্য হয় না। দেবমানে একশো বছর স্বর্গের ইন্দ্রত্ব অধিকার করেছিলাম। সেই সময় মহর্লোকবাসী ভৃগুমুনিরা হঠাৎ স্বর্গে আসেন। তাদের আগমনের কারণ হল এই যে, মহাপাতকীদের স্পর্শে তীর্থসমূহ মলিন হয়ে যায়, সেই মলিনতা দূর করে পবিত্র করবার জন্য তারা স্বর্গতীর্থে বিচরণ করতে আসেন। তাদের দর্শনে মানুষেরা পবিত্র হয়, তাদের স্পর্শনে নদনদী পবিত্র হয়। তখন দেখলাম সমস্ত দেবতা, ঋষি ও বৃহস্পতি, এমনকি শ্রীলিঙ্গুও সসম্ভ্রমে সেই মহর্লোকবাসী মহর্ষিদের অর্চনা করলেন। আমি নতুন লোক, তাদের মর্যাদা কীভাবে দিতে হয় জানি না। কেননা আমি সর্বদা বিষ্ণুসেবানন্দে নিমগ্ন থাকতাম। গুরু বৃহস্পতির নির্দেশে আমিও সেই মহর্ষিদের পূজা করলাম। তাঁরা যথাস্থানে চলে গেলে ভগবান উপেন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।

আমি দেবতাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, আর আপনারা দেবতারা মহর্ষিদের পূজা করেন। এই মহর্ষিদের মাহাত্ম্য কী এবং তারা কোথায় বাস করেন?' দেখলাম দেবতারা মহা অভিমানী। তারা নিরুত্তর। আমার প্রশ্নের উত্তরে দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন, 'হে দেবরাজ! এই স্বর্গের উপরের দিকে মহর্লোক আছে। মানুষেরা শুভকর্মের দ্বারা ঐ লোক লাভ করতে পারে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রলয় হয়ে গেলেও এই মহর্লোক বিদ্যমান থাকে। আসন্ন মুক্তি-অধিকারী ব্যক্তিরা মহর্লোকে বাস করে। ঐ লোক ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকে। পৃথিবীর সাম্রাজ্যসুখ থেকে ইন্দ্রপদে কোটিগুণ সুখ। সেইরকম ইন্দ্রপদ থেকে ঊর্ধ্বলোকের প্রজাপতিপদে কোটিগুণ সুখ। সেই সুখে এই ভৃগুআদি মুনিরা বাস করেন। সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে পদে পদে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পূজা করে তাঁরা ধন্য হন।'

বৃহস্পতির কথা শোনামাত্রই আমি ইন্দ্রপদে বিরক্ত হলাম। মনে করলাম মহর্লোকে যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করব। সেই সংকল্প নিয়ে জপ করতে লাগলাম। জপপ্রভাবে ব্যোমযান উপস্থিত হল। তাতে চেপে আমি মহর্লোকে পৌঁছলাম। ত্রিলোকে যে সুখ, যে বৈভব, যে ভজন নেই, মহর্লোকে সেই সমস্ত নির্দোষ সুখ, বৈভব ও ভজনাদি দর্শন করলাম। ভৃগু প্রমুখ হাজার হাজার ভক্তিপর মহর্ষি মহা মহা যজ্ঞ বিস্তার করেছেন। আর যজ্ঞাগ্নি থেকে দীপ্তিমান স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর আবির্ভূত হয়ে সমস্ত যজ্ঞভাগ ভোজন করছেন। তাঁর তেজ কোটিসূর্যের মতো উজ্জ্বল। তিনি দুই বাহু প্রসারণ করে যাজকদেরকে ইষ্টবর প্রদান করছেন। আমি সেই ভগবানকে আনন্দে প্রণাম নিবেদন করলাম। তা দেখে ভগবান যজ্ঞেশ্বর সস্নেহে আমাকে ডেকে স্বহস্তে নিজ উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ দান করলেন। তাঁর করুণাতিশয় লাভে নিজেকে সর্বপ্রকারে কৃতকৃতার্থ মনে করলাম। মহর্ষিরা আমাকে বললেন, 'হে বৈশ্যকুমার! আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করছি, শীঘ্র স্বীকার কর। এই মহর্লোকের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব স্বয়ং সমাগত হয়। তুমি চিরদিন যাকে দেখতে চাও সেই জগদীশ্বরকে চিরকাল দর্শন কর এবং যজ্ঞের দ্বারা তাঁর পূজা কর। আমি বললাম বৈশ্য-দেহ নিয়ে আমি সুখে আছি কেননা এই দেহ দ্বারা প্রভুর এবং তাঁর ভক্ত-ব্রাহ্মণদের সেবা করে অধিক সুখ পাই। আমি ব্রাহ্মণত্ব না নিলেও তারা আমাকে আদর করতে লাগলেন। মহাসুখে সেখানে বাস করলাম। মহর্লোকে স্বর্গের মতো শোক বা ভয় নেই। যজ্ঞেশ্বরের প্রীতির জন্য কেবল যজ্ঞ উৎসর্গ হয়ে থাকে, অন্য কোনও বিষয়ভোগও নেই, অন্য কোনও কর্তব্যেও এই ব্রাহ্মণদের রুচি নেই। কিন্তু যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হন। তখনি আমার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। সহস্র চতুর্যুগের বা ব্রহ্মার একদিনের অবসানে প্রলয়ের সময় ত্রিলোক দগ্ধ হলে সেই তাপে মহর্লোকও তাপিত হয়। তখন মহর্লোকের মহর্ষিরা জনলোকে গমন করেন। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হলে যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের অভাবে

যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায় না। তাঁর অদর্শনে যে তাপ উপস্থিত হয় সেই তাপ প্রলয়কালীন তাপ থেকেও অধিক। মহর্লোকে আমি অবস্থান করলেও নির্জনে থাকলেও পূর্বের মতো নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করতাম। তখন ব্রজভূমি দর্শনের ইচ্ছায় শোকাতুর হতাম। তখন যজ্ঞেশ্বর আবির্ভূত হয়ে আমাকে আদর করতেন আর আমার সমস্ত দুঃখ দূর হত। যজ্ঞেশ্বরের পূজা উৎসব দেখে, বিশেষত তাঁর করুণা লাভ করে আমি আনন্দে আত্মহারা হতাম, সেজন্য অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা করিনি। কিন্তু একদিন মহর্লোকবাসীগণ প্রলয়কালীন দাহপীড়ার ভয়ে জনলোকে গমন করলেন। তাদের সঙ্গে আমিও জনলোকে গেলাম। মহর্লোক ও জনলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলেও জনলোকের অধিবাসীরা প্রলয়দাহ অনুভব করেন না।

সেখানে বাসকালে একসময় মহাতেজোসম্পন্ন দিগম্বর পাঁচ বছরের বালকের মতো দেখতে একজন ঊর্ধ্বলোক থেকে সমাগত হল। সমস্ত মুনিঋষি যজ্ঞানুষ্ঠান ত্যাগ করে তাকে সম্মান প্রদর্শন, প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। আমি তখন মহর্ষিদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ বালক কে? কোথায় বাস করে? আপনারাই বা কেন ঐ বালকের পূজা করছেন?' মহর্ষিরা বললেন, 'উনাকে বালকবৎ দেখতে হলেও আমাদের মধ্যে উনিই জ্যেষ্ঠ, মহোত্তম। উনি আত্মারাম ও আপ্তকামের আদি আচার্য এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। উনার নাম শ্রীসনৎকুমার। এই জনলোকের উপরে যে তপোলোক আছে সেখানে উনি বাস করেন। উনার আরও তিন ভাই আছেন—সনক, সনন্দন ও সনাতন। তাঁরাও উনার মতো যোগীন্দ্র। কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন প্রমুখ যোগীন্দ্ররাও সেখানে বাস করেন। কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত ফলে তপোলোক লাভ করা যায়। সেখানে মঙ্গল আনন্দ বিরাজ করছে। আমাদের এই মহর্লোক বা জনলোকের প্রাজাপত্য সুখ থেকে তপোলোকের সুখ কোটিগুণ অধিক। এই জনলোকে যদিও প্রলয়তাপ নেই, কিন্তু ত্রিলোকের দাহ প্রভৃতি অমঙ্গল

দর্শনজনিত মনোপীড়া আছে। তপোলোকে সেই পীড়াও নেই। সেই লোক কেবল ঊর্ধ্বরেতা যোগীন্দ্রদের যোগ্য স্থান।'

আমি ভাবতে লাগলাম, তপোলোকে সনৎকুমারের মতো মহাত্মাগণ বাস করেন, সেখানে কিরকম সুখ এবং তাদের পূজনীয় ভগবানই বা কি রকম? তা দর্শন সংকল্প নিয়ে সমাহিত চিত্তে মন্ত্র জপতে লাগলাম। জপ প্রভাবে আমিও সনৎকুমারের মতো পরম তেজস্বী হলাম এবং অতি দ্রুত বেগে সেই তপোলোকে উপস্থিত হলাম। সেখানে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুষ্কুমারকে দর্শন করলাম। তাঁরা যদিও ভগবানের মতো লক্ষণান্বিত ছিলেন না, তবুও তাঁদেরকে দর্শন করলে স্বভাবতই হৃদয়ে অপার আনন্দ উপস্থিত হতো। এই সমস্ত যোগীন্দ্রগণ সর্বদা ধ্যাননিষ্ঠ থাকেন। শুনেছিলাম এখানে ভগবান প্রকটভাবে বিরাজ করেন। তাই তাঁকে দর্শনের ইচ্ছায় ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। কিন্তু দর্শন না পেয়ে মহামুনিগণকে জিজ্ঞাসা করলাম। মুনিগণ কোন উত্তর দিলেন না। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে স্তব, প্রণাম প্রভৃতি করলেও তাঁরা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। কেননা তাঁরা প্রায়ই সমাধিস্থ থাকেন এবং কদাচিৎ পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী ও বাহ্যপূজাদি করে থাকেন। তাঁরা আত্মরতি, অন্য কোনদিকে মনোযোগ নেই। তাঁরা পূর্ণকাম। আমার ভগবৎ দর্শনের আশা সেখানে সিদ্ধ হল না। আত্মারামগণের সঙ্গে থেকে আমার সেই আশা ক্ষীণ হতে লাগল। কিন্তু তপোলোকের স্বভাবজাত চিত্ত প্রসন্নতা থাকে। তাই আগের তুলনায় অধিকতর রূপে আমার মন্ত্রজপ সম্পাদিত হচ্ছিল। শেষে জগদীশকে তপোলোকে দর্শন না পেয়ে দর্শন-ইচ্ছা প্রবল হলে আমি পৃথিবীতে নীলাচলে স্থিরভাবে বিরাজমান জগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম। এমন সময় শ্রীঋষভদেবের পুত্র পিপ্পলায়ন আমাকে বললেন, 'এই মহৎ স্থান ত্যাগ করে কেন কোথায় তুমি যেতে চাইছ? ভগবানকে দর্শন করবার জন্য বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। তুমি সমাধি অবলম্বন করে নিজ মন স্থির কর। তা হলেই ভগবান অন্তরে ও বাইরে সর্বত্র অবস্থান করলেও

তাঁকে প্রত্যক্ষের মতো দর্শন হবে। শুদ্ধচিত্তে ভগবান বাসুদেব স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অন্য কোন প্রকারে তাঁর দর্শন লাভ হয় না। শ্রীভগবান করুণা করে কখনও কখনও জীবের বাহ্য চক্ষুগোচর হন, কারণ তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তবুও তাঁর দর্শনে যে আনন্দ হয়, তা আনন্দযোনি মানসেই সঞ্চারিত হয়। ধ্যানবলে যে ভগবৎ-দর্শন হয় তাও প্রত্যক্ষ দর্শনের মতো হয়ে থাকে এবং সেই রূপেই প্রভু বর প্রদান করে কৃপাবিশেষ বিস্তার করে থাকেন। শ্রীব্রহ্মাই এ বিষয়ের প্রমাণ। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনেই ভক্তদের আনন্দ হয়। কিন্তু অভক্তদের আনন্দ হয় না। ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করেও কংসের হৃদয়ে ভয়, দুর্যোধনের হৃদয়ে দুষ্টবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছিল। নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণই মুখ্য ভক্তি। কারণ স্মরণে মনোবৃত্তি শ্রীভগবানের সমর্পণ করতে পারা যায়। মনের স্থিরতা হলে জ্ঞান বৈরাগ্য থেকেও অন্তরঙ্গ প্রেমভক্তি রুচি অনুসারে অবিরাম স্ফুরিত হয়ে থাকে। মন স্থির করা যদি দুষ্কর বলে বিবেচনা কর তবে ভারতবর্ষে গমন কর। সেখানে গন্ধমাদন পর্বতে নরনারায়ণকে দর্শন কর। সেই প্রভু লোকশিক্ষার্থ ধনুর্বিদ্যার গুরুরূপে ব্রহ্মচারী বেশে জটাধারী রূপে তপস্যা করছেন।' আমি সেখানে যেতে উদ্যত হলে চতুষ্কুমার আমাকে বললেন, 'এখানেই তুমি ভগবানকে দর্শন কর।' আমি অবাক হয়ে দেখলাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার নিজেরা কেউ নারায়ণ রূপ, কেউ স্বর্গের উপেন্দ্র রূপ, কেউ মহর্লোকের যজ্ঞেশ্বর রূপ, কেউ বামনাদি রূপ হলেন। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলিপূর্বক প্রণাম করতে করতে বললাম, 'হে দীনবৎসলগণ, আমি বহু অপরাধ করেছি। আপনারা ক্ষমা করুন।' তখন তাঁরা আমার মস্তক স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শ প্রভাবে আমি সমাধিস্থ হলাম। সমাধিতে পূর্বদৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত মূর্তি সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। পরে সমাধি ভঙ্গ হলে সেই বিষ্ণুমূর্তিসমূহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে লাগলাম। ভগবৎ দর্শনে জপ করার আনন্দ বৃদ্ধি পেত। কিন্তু যখনি আমি জপ করতাম তখনি বৃন্দাবনের মাধুরী, বিরহ, শোক হৃদয়ে উদয় হয়ে আমাকে ব্যাকুল করত। তাতে আমি বিলাপ করতাম। মহর্ষিগণ মধুর বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন পুষ্কর দ্বীপে নিজভক্তদেরকে কৃপাবশত দর্শন দেওয়ার জন্য হাঁসের পিঠে চড়ে শ্রীব্রহ্মা তপোলোকে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পরিজন ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন বলে মনে হল। যদিও তাঁকে দেখতে বৃদ্ধের মতো তবুও তাঁর শরীরে জরার আবির্ভাব নেই। তিনি সনক প্রমুখ মহর্ষিদের বারংবার স্নেহভরে আশীর্বাদ করলেন এবং কিঞ্চিৎ ভগবদ্ভক্তি রহস্য উপদেশ করে পুষ্কর অভিমুখে গমন করলেন। তাঁর বিষয়ে আমি যখন সনৎকুমারদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা হাসতে হাসতে বললেন, 'হে গোপবালক! তুমি এতদিন এখানে বাস করলে অথচ পরমপ্রসিদ্ধ উনার তত্ত্ব জান না? উনার নাম ব্রহ্মা, ইনি প্রজাপতিদের পতি ও আমাদের পিতা। ইনি স্বয়ম্ভু। শ্রীব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বকে পালন করেন এবং বেদ প্রচার করে ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁর বাসস্থান সত্যলোকে। ভূলোকে শতজন্মকৃত স্বধর্ম আচরণ করে সেই সত্যলোক লাভ করা যায়। সেই সত্যলোকে যে বৈকুণ্ঠ আছে সেখানে সহস্রশীর্ষা নামে শ্রীজগদীশ্বর সর্বদা অবস্থান করছেন।'

তাঁদের কথা শুনে সত্যলোকে ভগবানকে দর্শন করার জন্য জপে নিবিষ্ট হলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখলাম আমি সত্যলোকে উপস্থিত হয়েছি। আর শ্রীজগদীশ্বরও আমার সামনে। তাঁর সহস্র বাহু, সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ। তিনি নীল মেঘের মতো আভাযুক্ত। তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র ভূষণ। তাঁর নাভিদেশে প্রফুল্ল কমল। তিনি শেষনাগের শয্যায় শায়িত আছেন। তিনি নিখিল জগতের মনোনেত্র-অভিরাম অর্থাৎ আনন্দজনক। শ্রীরমাদেবী তাঁর চরণসেবা করছেন। গরুড়দেব কৃতাঞ্জলি হয়ে বসে আছেন। জগদীশ্বর তাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করছেন। নারদমুনি নৃত্যগীত করছেন। ব্রহ্মা বিচিত্র বৈভবের দ্বারা তাঁর অর্চনা করছেন। অর্চনা শেষ হলে ভগবান কোন নিগূঢ় অর্থসূচক ভক্তি উপদেশ করছেন। আমি সেই

সব দেখে আনন্দে মূর্ছিত হলাম। আমার বৈকল্য দেখে ভগবৎ প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবী তাঁর স্নিগ্ধ করস্পর্শে আমাকে সচেতন করলেন এবং তিনি করুণাবশত হাত ধরে আমাকে জগদীশ্বরের কাছে নিয়ে গেলেন। ভগবানকে বার বার প্রণাম করে নিজের মনকে বলতে লাগলাম তুমি স্থিরভাবে আনন্দ উপভোগ কর। এই সত্যলোকে কোন রকমের শোক, সন্ত্রাস, দুঃখের লেশও নেই। আনন্দ ব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠতম স্থান বলে জগতের সবাই সত্যলোকের অর্চনা করে থাকেন। দেখলাম, প্রভু নিদ্রালীলা অবলম্বন করলেন। ব্রহ্মাও প্রভুর মহাঅদ্ভুত নাভিকমল নিরীক্ষণ করে সৃষ্টিরীতি শিক্ষা গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড রচনারূপ নিজকার্যের জন্য সেখান থেকে বহির্দেশে গমন করলেন। আমি প্রভুর সেই মহাঅদ্ভুত রূপ তাঁর নাভিকমলে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান চৌদ্দভুবন যুগপৎ নিরীক্ষণ করলাম। নিগূঢ় ভক্তিরহস্য শ্রবণে ব্রহ্মার প্রেমপ্রবাহ দেখে সেখানে সুখে বাস করছিলাম। দিন অবসানে রাত্রি হল। ত্রিলোক নষ্ট হল। শ্রীভগবান তখন ব্রহ্মার সঙ্গে শেষশয্যায় শয়ন করলেন। জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক বাসীগণ বিচিত্রবাক্যে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মালোকে আমি সেই কৌতুক দর্শন করলাম।

কখনো ভগবান অন্তর্হিত হয়ে কোথাও গমন করলে আমি শোকাতুর হতাম। আবার তিনি ফিরে এলে আমার শোক দূর হত। এভাবে ব্রহ্মার কিছুদিন গত হলে একদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মা কৌতুকবশত প্রলয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জ স্পর্শ করলেন। সেই ফেনপুঞ্জ থেকে এক প্রকাণ্ডকায় ভয়ঙ্কর দৈত্য আবির্ভূত হল। সেই অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে ব্রহ্মা কোন এক নিভৃত স্থানে লুকিয়ে থাকলেন। যদিও ভগবান শ্রীনারায়ণ সেই দৈত্যকে বিনাশ করলেন তবুও ভয়াতুর ব্রহ্মা আর ফিরে এলেন না। প্রভু জগদীশ্বর তখন আমাকে ব্রহ্মার পদে নিয়োগ করে ব্রহ্মার অধিকার দান করলেন। আমি ব্রহ্মার পদের অধিকারী হয়ে ভগবৎ ভক্তি বৃদ্ধির জন্য বৈষ্ণব সৃষ্টি করলাম। সেই বৈষ্ণবদেরকে প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্যাদির অধিকারে

নিযুক্ত করলাম। জগদীশ্বরের অর্চনা করতে লাগলাম। তাতে সারা ব্রহ্মাণ্ড পরমানন্দে পরিপূর্ণ হল। সমস্ত বেদ, পুরাণ, তীর্থ, ঋষি বহুভাবে আমার স্তব করতে লাগলেন। কিন্তু আমার অসুবিধা বোধ হল। ব্রহ্মাপদের এত বিশাল কর্তব্য যে সমুদ্র বললেই হয়। তাতে কেউ স্থির থাকতে পারে না। আমি সেই কর্তব্যসমুদ্রে সর্বদা ডুবেই ছিলাম। এজন্য ভক্তিসুখ লাভ করতে পারিনি। আমার আয়ু দুই পরার্ধ কাল, এই কথা শুনেই কালভয়ে ভীত হয়ে ভয় নিবারণের জন্য মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। মন্ত্র জপ কালে বৃন্দাবন ভূমির বিরহ দুঃখ অনুভূত হত। আমি জগদীশ্বরের অতি কাছে থাকলাম। পিতৃবুদ্ধিতে তাঁর সেবা করতাম। কখনো সেবা অপরাধ হয়ে গেলেও দয়ালু প্রভু আমার সেসব অপরাধ মার্জনা করতেন। মার্জনা করলেও নিজেকে অপরাধী ভেবে উদ্বিগ্ন হতাম। সেই উদ্বেগ অবগত হয়ে লক্ষ্মীদেবী মায়ের মতো স্নেহবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিতেন। এভাবে বহুকাল সুখে বাস করছিলাম।

একদিন দেখলাম সত্যলোকবাসী ব্রহ্মর্ষিগণ ভারতবর্ষের কোনও প্রাপ্তমুক্ত জীবের ভক্তিসহকারে প্রশংসা করছেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুক্তি কী? সেই মুক্তি লাভের জন্য আপনারা এত প্রশংসা করছেন কেন?' সেই সভায় মূর্তিমতী উপনিষদ দেবীগণ শ্রুতি, স্মৃতি সকলে মিলিতভাবে বললেন, 'পরম উৎকৃষ্ট, পরম দুর্লভ মোক্ষ বা মুক্তি একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানে লাভ করা যায়।' মূর্তিমান সাত্বত তন্ত্র, আগম, মহাপুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রমুখ হাস্য করে মৌন থাকলেন। কেউ কেউ বললেন, ভগবৎ মন্ত্র জপ প্রভাবে মোক্ষ লাভ হয়। কেউ কেউ সেই কথায় বিবাদ বাধিয়ে তুললেন। পরে বুঝলাম যে ব্রহ্মারও গোপ্যবস্তু ভক্তিসুখ। মোক্ষ বা মুক্তিসুখ থেকে কোটিগুণ অধিক হচ্ছে ভক্তিসুখ। ভগবানের নাম মহিমা দূরে থাক্ তাঁর নামাভাসেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। সেই মোক্ষ নিরাকার এবং বৈচিত্র্যহীন জ্যোতির মতো। শুষ্ক জ্ঞানীরা এই মোক্ষ পেতে চায়। কংস অঘাসুর প্রভৃতি কৃষ্ণবিরোধী মহাদুষ্ট অসুরেরাও এই মোক্ষ লাভ

করে থাকে। কৃষ্ণভক্তি দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা-আনন্দ লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মধূলি অঙ্গে ধারণ করবার বাসনায় ব্রহ্মাও ব্রজভূমির তৃণ হয়ে জন্মাবার অভিলাষ করে থাকেন। তাঁরা আমাকে বললেন, 'যদি মোক্ষের তুচ্ছতা অনুভব করে থাকো তবে বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠারূপ সম্পত্তি ইচ্ছা কর। পরম অনুরাগের সঙ্গে নিজমন্ত্র জপ কর এবং মহারহস্য শ্রবণ করে হৃদয়ঙ্গম কর। এই ব্রহ্মাণ্ডের আট আবরণ পার হলেই নির্বাণ পদ বা সাযুজ্য মুক্তিপদ লাভ করা যায়। সেই স্থান মহাকালপুর নামে আখ্যাত।' সত্যলোকে ভগবানকে পিতারূপে গ্রহণ করে আমি তাঁর দ্বারা লালিত হয়েছিলাম। তাঁকে ত্যাগ করে কীভাবে অন্যত্র যাব সেই চিন্তা করছিলাম। তখন স্নেহময় ভগবান সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে বললেন, তুমি ব্রজভূমিতে যাও। সেটি আমার ক্রীড়াস্থলী। সেখানে আমার প্রিয়তম তোমার গুরুদেবকে পুনর্প্রাপ্ত হও। তারপর তাঁর কৃপায় তুমি সব তত্ত্ব জানবে। তারপর শীঘ্রই মহাকালপুরে এসে আমাকে দর্শন পাবে। এই সত্যলোক অপেক্ষাও মহাকালপুর মুক্তিপদে প্রচুরতর আনন্দ প্রাপ্ত হবে এবং যথেচ্ছ ভ্রমণ করে বহু আশ্চর্য অনুভব করবে।

ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে দেখলাম, পূর্বকালে যেখানে যে যে দেব-মনুষ্যাদি ছিল, কোথাও তার চিহ্নমাত্রও নেই। কিন্তু সেই মথুরা, গোবর্ধন, যমুনা রয়েছে। বন তরুলতার দ্বারা পূর্বের মতো সুশোভিত আছে। স্থাবর-জঙ্গম, মানুষ-পশুপাখি ইত্যাদি প্রাণীরা বৃন্দাবনে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে এক কুঞ্জে আমার গুরুদেবকে প্রেমমূর্ছিত অবস্থায় দেখলাম। বহু প্রয়াসে তাঁকে সুস্থ করলাম। তাঁকে প্রণাম করলে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমার মুক্তিপদ গমন ইচ্ছা তাও তিনি সর্বজ্ঞতা বলে অবগত ছিলেন। গুরুদেব আমাকে বললেন, 'বৎস! আমি তোমাকে সর্বস্ব প্রদান করেছি। কারণ তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য। অন্য যত রহস্য আছে তা সবই জানতে পারবে এবং মন্ত্র প্রভাবে লাভ করবে।' আমি আনন্দে তাঁর চরণে পতিত হলাম। কিন্তু তক্ষুনি তিনি অলক্ষিতভাবে

কোথায় চলে গেলেন।' তখন মন কাতর হলেও ধৈর্য ধরে জপে প্রবৃত্ত হলাম। জপপ্রভাবে মনে হল যেন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ কোন এক অপার্থিব দেহে পরিণত হয়েছে। তারপর সূর্যমণ্ডল ভেদ করে ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে করতে চৌদ্দভুবন অবলোকন করতে লাগলাম।

বৈকুণ্ঠের সৌম্য দর্শন পার্ষদগণ মনোরম দিব্য জ্যোতির্ময় বিমানে চড়িয়ে আমাকে বললেন, মানুষ দেহে বৈকুণ্ঠ-সুখ অনুভূত হয় না, তুমি চতুর্ভুজ হয়ে সারূপ্য গ্রহণ কর। আমি অসম্মত হলাম। তাই ভৌম বৃন্দাবনে গোবর্ধন স্থানে যে দেহ ধারণ করেছিলাম সেই দেহেই ছিলাম; তবুও তাঁদের প্রভাবে আমার অঙ্গ উজ্জ্বলকান্তি ও সর্বসামর্থ্য গুণযুক্ত হয়েছিল। বৈকুণ্ঠ যাত্রাপথে পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বলোকগুলি নজরে পড়তে লাগল। কিন্তু আমার কোন আকর্ষণ ছিল না, তা দর্শনীয় বিষয় বলেও বোধ হল না। স্বর্গলোকের সৌধ ও নন্দন-কাননাদি, আরও ঊর্ধ্বলোকসমূহের বাহ্য স্থানগুলি, সত্যলোকের বিশাল বৈভব থাকলেও সেগুলি আমি দৃষ্টিপাত করতে চাইনি, কেননা দর্শনস্পৃহা আমার অন্তঃকরণে ছিল না। ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা আমাকে তাকিয়ে পূজা করতে লাগলেন, ব্রহ্মা প্রমুখ লোকপালগণ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সাঞ্জলি মস্তকে আমার প্রতি খই, ফুল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য উৎক্ষেপ করতে লাগলেন। যে যে লোকের নিকট দিয়ে যাত্রা করছিলাম, সেই সেই লোকের অধিকারীগণ জয় জয় শব্দে আমার স্তুতিগান করছিলেন এবং আমার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম মহা আবরণ ভেদ করলাম। তারপর জ্যোতির্ময় মুক্তিপদ স্থানে এসে পৌঁছলাম। সেই ব্রহ্মজ্যোতির্ময় সাযুজ্য মুক্তি স্থানকে অবজ্ঞা করে ঊর্ধ্বদিকে যেতে লাগলাম।

অবশেষে মুক্তিপদ অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে আমি সাকার রূপে দর্শন করলাম। কিন্তু পূর্বের মতো প্রীতিলাভ করতে পারিনি। বরং সেই পুরুষে আমি লীন হয়ে যাব, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হতাম। যদি লীন হয়ে যাই তবে চিরকালের জন্য আমার ইষ্টদেব দর্শন আশা নষ্ট হয়ে যাবে। এই

ভয়ে ব্যথিত হতাম। তাই আবার ব্রজভূমিতে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সেই সময় গীত ও বাদ্যধ্বনি শুনতে পেলাম। দেখলাম, বৃষের পিঠে চড়ে একজন পুরুষ উর্ধ্বলোক থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর শরীর কর্পূরের মতো গৌরবর্ণ। তাঁর ত্রিনয়ন। তিনি দিগম্বর। অর্ধচন্দ্র মৌলি ও গঙ্গাবারিধৌত জটাবলী ধারণ করে তিনি শোভা পাচ্ছেন। তাঁর দেহে ভস্মের অঙ্গরাগ, গলায় অস্থিমালা, হাতে ত্রিশূল। তাঁর ভক্তরা কেউ তাঁকে চামর ঢুলাচ্ছে, কেউ ছত্র ধারণ করে আছেন। আমি তাঁকে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম এবং মনে মনে ভাবলাম এই মুক্তিপদের উপরে কোন্ লোকে উনি বাস করেন, উনি কে? তাঁকে আনন্দে প্রণতি নিবেদন করলাম। তিনিও কৃপাদৃষ্টি দান করলেন। তাঁর মুখ্য সেবক নন্দীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ পুরুষ কে, কোথায় থাকেন, কোথায় যাচ্ছেন?'

নন্দীশ্বর বললেন, 'হে গোপাল-উপাসক! তুমি জগদীশ্বর শিবকে জানো না? উনি ভুক্তি-মুক্তি দাতা এবং উনি ভক্তদের ভগবদ্ভক্তি বর্ধিত করেন। উনি গৌরীপতি শিব, সমস্ত মুক্তদের পূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ। উনি নিজলোক থেকে কৈলাসে গমন করছেন, তাঁর সখা কুবেরের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি শিব ও কৃষ্ণে অভেদবুদ্ধি করে ভক্তি করে সেই ব্যক্তি শিবধাম লাভ করে।

সে কথা শুনে আমি আমার মদনগোপালের সঙ্গে শিবের অভিন্নতা মনে করে শিবের কৃপা পেতে ইচ্ছা করলাম। মহাদেব আমার অভিপ্রায় জেনে নন্দীশ্বরকে আদেশ করলেন এবং নন্দীশ্বরের নির্মল উপদেশে আমার হৃদয়ে অভেদতত্ত্ব স্ফূর্তি পেল। তখন বুঝলাম মদনগোপাল থেকে উনি অভিন্ন এবং উনি ভক্তদের ভক্তি বৃদ্ধি করে থাকেন। অতএব, মহাদেবে ভক্তি করলে মদনগোপালকে পেতে পারি। গোপালের প্রতি বেশী ভক্তি লাভ হবে। তাই মহানন্দে শিবভক্তদের মধ্যে প্রবেশ করলাম। শিববাহন নন্দী বৃষভের কাছে থেকে শিবকথা শুনতে আমার প্রীতি জন্মাল। শুনলাম, শিব ঈশ্বর হলেও দাসের মতো নিত্য নিজপ্রিয় সহস্রবদন শেষমূর্তি

ভগবানের প্রেমসহকারে অর্চনা করে থাকেন। শিবলোকের সর্বাপেক্ষা অধিক ও বিশেষ মাহাত্ম্য জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। কিন্তু তবুও হৃদয় কেমন অপূর্ণের মতোই বোধ হয়েছিল। তাই আমি গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্র জপে মগ্ন হলাম। মদনগোপালের মাধুরী অনুভব করতে না পেরে যদিও অতৃপ্তের মতো ছিলাম তবুও ভাবলাম নিঃসন্দেহে মহাদেবের কৃপায় দীর্ঘবাঞ্ছা শীঘ্রই সিদ্ধ হবে। তারপর শুনতে পেলাম দূরে কোন মহাত্মাদের অতি মধুর সঙ্গীত ধ্বনি। সেই সঙ্গীত শুনে পরমানন্দে শিব প্রেমবিকারে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। পার্বতীদেবীও নন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংকীর্তন করে প্রভু শিবের উৎসাহ বর্ধন করতে লাগলেন। দেখলাম, চারবাহু বিশিষ্ট অপরূপ সুন্দর কয়েকজন পুরুষ এলেন। তাঁদের উজ্জ্বল দেহজ্যোতিতে শিবলোকের বাসিন্দারা আচ্ছাদিত হলেন। তাঁদের পরিচ্ছদও মনোহর। তাঁদের দেখে আমার মন এমন আকৃষ্ট হল যে, আমি মূর্ছিত হলাম। ক্ষণিক পরে সুস্থ হয়ে নীরব থাকলাম। মনে মনে ভাবলাম শিবের কৃপায় এই ভগবৎ পার্ষদেরা আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত হয়ত করতে পারে। আরো ভাবলাম এঁরা কোথায় থাকেন, দেখলাম তাঁদেরকে আলিঙ্গন করে শিবও প্রেমভাবে মূর্ছিত হলেন। আমার মনোভাব জেনে পার্বতীদেবী গণেশকে কিছু বলতে আদেশ করলেন। গণেশ আমাকে বললেন, 'এঁরা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্ত-সারূপ্য পার্ষদগণ। এঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছেন। ঐ দেখো, এঁরা চতুর্মুখ ব্রহ্মার অধিকৃত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের দিকে যাচ্ছেন। আরও দেখো, অন্যান্য পার্ষদগণ অন্যান্য বড় বড় ব্রহ্মাণ্ডের দিকে যাচ্ছেন।' গণেশ আমাকে আরও বলতে লাগলেন, 'চতুর্মুখ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডটি শতকোটি যোজন পরিমিত। অষ্টমুখ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডটি তার দ্বিগুণ এবং আরও আরও অন্যান্য ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডগুলি বহুগুণ বৃহত্তর।' আমি গণেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভগবানের পার্ষদগণ ঐসব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করছেন কেন?'

তিনি বললেন, 'এই বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রভু বৈকুণ্ঠনাথের নাম উচ্চারণকারী ভক্তদের যাতে ভক্তিবিঘ্ন না হয় সেজন্য তাদের রক্ষা করতে তাঁরা গমন করেন।' আমি বৈকুণ্ঠ-পার্ষদদের সঙ্গে ব্রহ্মাপুত্র চতুষ্কুমারকেও দেখতে পেলাম। জানতে চাইলাম, এঁরা সঙ্গে কেন? গণেশ বললেন, 'চতুষ্কুমারগণ তপোলোকে থাকেন। সেখানে ধ্যানে ভগবৎ-দর্শন করেন, সেখানে হরিনাম সংকীর্তনের মঙ্গল বিধান করবার জন্য বাস করেন। তাঁরা ধ্যানে সন্তুষ্ট না হয়ে বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করতে আসেন।' তারপর বললেন, 'হে গোপকুমার! তুমি যদি আমার পিতার করুণা লাভ কর, তবে তুমি বৈকুণ্ঠলোকের মহিমা শ্রবণ করতে পারবে।' আমি মনে মনে বিচার করে স্থির করলাম, আমি বৈকুণ্ঠ বাসের অযোগ্য। আর তক্ষুনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে মূর্ছিত অবস্থায় আমি ভূপতিত হলাম। সেই সময় মহাদেব আমাকে তুলে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'হে বৈষ্ণব, তোমার মতো আমিও পার্বতীসহ বৈকুণ্ঠলোকে সর্বদা বাস করতে চাই। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিরা, ব্রহ্মা স্বয়ং এবং আমিও সেই বৈকুণ্ঠ লাভের জন্য সাধনা করছি। নিষ্কামভাবে স্বধর্মে নিষ্ঠা থাকলে শ্রীহরির কৃপায় সেই ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তার উপর যদি শ্রীহরির শতগুণ অধিক কৃপা হয়ে থাকে তবে সে মত্ভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমার প্রতি ভগবান শ্রীহরির যতটুকু কৃপা তার শতগুণ অধিক কৃপা হলে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করা যায়। হে গোপকুমার, তুমি সেই লোক লাভের উপযুক্ত। কেননা তুমি শ্রীহরির ভক্ত এবং তাঁর প্রিয়জনের শিষ্য এবং তাঁর মন্ত্রজপে অনুরক্ত। হে গোপকুমার, যারা কৃষ্ণবিমুখ তাদের কাছে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেমভক্তি সঙ্গোপন করবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। সেইজন্য আমি শ্রীকৃষ্ণবিমুখ যতীদেরকে ভ্রমসমুদ্রে ডুবিয়েছি। সাযুজ্যকামীদের গতি যে মুক্তিপদ, সেখানে ভক্তির গন্ধমাত্রও নেই। যারা ভগবদ্ ভজনানন্দ রস আস্বাদন করতে চায় তারা মুক্তি চায় না। তারা ভগবদ্ সেবানন্দই চায়।'

শিবের কৃপাশীর্বাদ নিয়ে শিবকে প্রণতি জানিয়ে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। দিব্য রথে করে দুইজন বিষ্ণুপার্ষদ আমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা আমাকে একটি মহাপুরীর দুয়ারে রেখে বললেন, 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর। তুমি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছ, তাই তুমি কি কি আশ্চর্য বস্তু দর্শন করতে পারছ তা গণনা করতে থাকো। আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ জানাতে যাচ্ছি।' এই বলে তারা পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন।

দেখলাম, একজন পুরুষ শত ব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত একটি বিমানে চড়ে এলেন। মনোরম অঙ্গকান্তি, কিশোর বয়স, মনোহর অলঙ্কার, চমৎকার শরীর ও নিদারুণ সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়ে অদ্ভুত গান করতে করতে তিনি পরমানন্দে পুরীমধ্যে প্রবেশ করছেন। আমি মনে করলাম তিনি বৈকুণ্ঠপতি শ্রীবিষ্ণু। তাই তাঁকে প্রণাম করলে তিনি আমাকে নিষেধ করে বললেন 'আমি প্রভুর দাসের দাস' এই বলে চলে গেলেন। তারপর দেখলাম, তার চেয়েও আরও অধিক বৈভবশালী একজন পুরুষ সমাগত হলেন। আমি মনে করলাম তিনিই জগদীশ্বর বিষ্ণু, তাই তাঁকে প্রণাম ও স্তুতি করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিবারণ করে পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর দেখলাম তার চেয়েও আরও অধিকতর বৈভবশালী পুরুষ, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলাম। তিনি পরিচয় দিলেন 'আমি বৈকুণ্ঠপতি নই, আমি তাঁর ভৃত্য'। এই বলে তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর কেউ একাকী, কেউ যুগলরূপে, কেউ দলবদ্ধভাবে এসে প্রভুর পুরীমধ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন। তাঁদেরকে আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, সকলেই উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীসম্পন্ন। আর যাকেই জগদীশ্বর মনে করে প্রণাম জানাচ্ছিলাম তিনিই নিবারণ করেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় ছিল তাঁরা দাসানুদাস। তাঁরা কেউ খালি হাতে ছিলেন না। তাঁদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে ছত্র, কোনও না কোনও সেবাসামগ্রী ছিল। লক্ষ্য করলাম, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ সেবাকর্মে ব্যগ্র, ব্যাকুল-অন্তঃকরণ,

ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং ভজনানন্দে বিভোর। তাঁদের সুমধুর বদন প্রভুর স্তবগানে মত্ত। কেউ কেউ তাঁর পুত্র-স্ত্রী-ভৃত্য প্রভৃতি পরিবারসহ, কেউ বা ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদসহ, কেউ কেউ নিজ পরিবারকে পুরীর বাইরে রেখে নিজে পুরীমধ্যে প্রবেশ করছেন, কেউ কেউ নিজ নিজ পরিবার পরিচ্ছদাদি বৈভব সব বাদ দিয়ে অকিঞ্চনের মতো ধ্যানরসে পরিপ্লুত হয়ে পুরীমধ্যে প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ বিচিত্র পশুপাখীর আকার ধারণ করে বিহারপূর্বক অন্যদের মন হরণ করছেন। কেউ মানুষরূপ, কেউ বানররূপ, কেউ দৈত্যরূপ, কেউ দেবরূপ, কেউ ঋষিরূপ ধারণ করছেন। কেউ ব্রাহ্মণরূপ, কেউ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি রূপ ধারণ করে নিজ নিজ ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের আচার গ্রহণ করেছেন। কেউ চতুর্ভুজ, কেউ অষ্টভুজ, কেউ চারমুখ, কেউ সহস্রমুখ, কেউ ত্রিনয়ন—বিচিত্ররূপ।

ব্রহ্মাণ্ডের যেমন অধিবাসীদের পরস্পর তারতম্য রয়েছে, সাম্য-বৈষম্য ও বিরোধ রয়েছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে তারতম্য থাকলেও কোনও বিরোধ-বৈষম্য বা হানি নেই। কারও মধ্যে মাৎসর্যাদি দোষ নেই। পরস্পর সৌহার্দ্য বিনয় সম্মান প্রভৃতি হাজার হাজার গুণ আছে। সেই সমস্ত গুণ স্বাভাবিক নিত্য ও সত্য। বৈকুণ্ঠবাসীগণ দিব্য বিচিত্র বিষয় ভোগ এবং নৃত্যগীত করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে সাংসারিক ভোগবিলাসী বিষয়ী লোকের মতো প্রতীয়মান হলেও তাঁরা প্রপঞ্চাতীত ত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহান মহান ব্যক্তিগণের পূজনীয়। বৈকুণ্ঠের বাসিন্দাগণ বিমানে করে বিহার করেন। সেই বিমানগুলি চিন্ময়। সেখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম বসন্তকালের মতো। কল্পবৃক্ষগুলি অত্যন্ত সুগন্ধময় ফুলে পরিপূর্ণ। সারা আকাশ জুড়ে সেই গন্ধ হাওয়াতে ভেসে বেড়ায়। সেই ফুলগুলি থেকে অমৃত মধু ঝরতে থাকে। পাতা, ফল-ফুলে নিত্য রঙ্গীনময় লতা বৃক্ষাদিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যেকের মন আমোদিত করে তোলে। বড় বড় জলাশয়গুলি বিচিত্র রঙের পদ্মফুলে সুসজ্জিত। আর তাতে সুদৃশ্য জলচর পক্ষীরা বিহার করে। বিমানে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ মহাআনন্দে বৈকুণ্ঠপতির গুণগান

করতে থাকেন। বৈকুণ্ঠবাসীগণ নিরতিশয় সুখে ভজনানন্দই সম্ভোগ করে থাকেন। শ্রীহরির চরণকমলে প্রণামমাত্রই তাঁরা বৈদূর্যমরকতস্বর্ণময় বিমানসমূহে পরিপূর্ণ হন। মৃদু হাস্যমুখী অতি সুন্দরী যুবতীদের পরিহাস প্রভৃতিতেও বৈকুণ্ঠবাসী রূপবান পুরুষদের হৃদয়ে রজোগুণের উদ্রেক হয় না, যেমনটি ব্রহ্মাণ্ডে হয়ে থাকে। সমস্ত সৌন্দর্য বৈভবে পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠবাসীদেরকে নিরীক্ষণ করে চিন্তা করলাম, যার সেবকবৃন্দ এমন মহিমাযুক্ত, না জানি সেই প্রভু কি রকম! কিছুক্ষণ পরে যারা আমাকে দুয়ারে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন তারা এসে আমাকে পুরীমধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক দরজা। প্রত্যেক দরজার সামনেই দ্বারপালগণ বিরাজ করছেন। সেই দ্বারপালগণ তাঁদের নিজ নিজ অধ্যক্ষকে জানিয়ে আমাকে প্রবেশ করাতে লাগলেন। দ্বারপালগণ গিয়ে সেই সেই প্রদেশাধিকারীগণকে প্রণাম করতে লাগলেন। আর আমি আগের মতোই সেই সেই দ্বারপাল অধিপতিগণকে জগদীশ বিবেচনা করে সম্ভ্রমে প্রণাম ও স্তব করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁরা যে কেউ জগদীশ নন এবং জগদীশ বিষ্ণুর কাছে যেতে হলে আরও অভ্যন্তর প্রদেশে যেতে হবে তা পরে পরে বুঝতে পারলাম। আমার প্রতি স্নেহযুক্ত পার্ষদগণ জানালেন যে, প্রভুর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে, যা অন্য কারও বক্ষে নেই। আরও বহু লক্ষণ তাঁরা বলতে লাগলেন। কিভাবে স্তব করতে হবে, তাও শেখালেন। তারপর বললেন, তুমি প্রভুকে প্রণাম করে তাঁর চরণারবিন্দের সম্মুখদিকে দৃষ্টিপাত করবে, তারপর নিশ্চল হয়ে এক পাশে দূরে সরে দাঁড়াবে। হাত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে থাকবে, সমস্ত ভাববিকার সম্বরণ করে থাকবে। এসব শিক্ষা পেয়ে আমি বহু মহা মহা চিত্র-বিচিত্র গৃহ ও দ্বারদেশ অতিক্রম করতে লাগলাম।

তারপর পরম উত্তম এক প্রাসাদ নিরীক্ষণ করলাম। সেটি এত উৎকৃষ্ট যে অন্যান্য সমস্ত প্রাসাদ যেন সেই প্রাসাদের চরণসেবা করে থাকে। তা কোটি কোটি চন্দ্রসূর্যের কান্তি বিকাশ করে মন ও নয়নের বৃত্তি হরণ করতে লাগল। রত্নাবলী শোভিত স্বর্ণময় সিংহাসনরাজের উপরে এক কোমল

মনোজ্ঞ উজ্জ্বল হংসতুলিকা আছে। তার উপরে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র থেকেও সুন্দর মৃদু উপাধান আছে। নিত্য নবযৌবন ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই উপাধানের উপরে নিজ বামকক্ষ ও কফোনি স্থাপন করে সুখে বিরাজ করছেন। ভগবানের জলভরা মেঘের শোভা হরণকারী সুন্দর মধুর অঙ্গকান্তিতে রত্নময় স্বর্ণালঙ্কার, বক্ষের কৌস্তুভমণি, কণ্ঠে মুক্তামালা, পরনে পীত পট্টবসন, অঙ্গের অনুলেপন, উপাধান হংসতুলিকা, সিংহাসন প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য বিভূষিত হচ্ছে। তাঁর মুখচন্দ্র স্মিত অমৃতে পূর্ণ। তাঁর নয়ন উৎফুল্লিত ও অত্যন্ত মনোহর। তাঁর বামপার্শ্বে মৃদুহাস্যময়ী লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। তিনি নম্র বচনভঙ্গী দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্ত হরণ করছেন। সুন্দর শরীরধারী সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, অসি, ধনুরাদি সমস্ত অস্ত্র নিজ নিজ চিহ্ন মস্তকে স্থাপন করে প্রভুর সেবা করছে। চামর, ব্যজন, পাদুকা, পরিচ্ছদগণে সুশোভিত ভগবানের মতো রূপমাধুরীযুক্ত সেবকবৃন্দ আদরভরে প্রভুর পরিচর্যা করছেন। শেষ, সুপর্ণ, বিষ্বক্সেন, জয়, বিজয়, নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ ভক্তিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে বিচিত্র বাক্যে প্রভুর স্তব করছেন। কখনও বা শ্রীনারদমুনির অদ্ভুত নৃত্য, বীণা গীতাদির ভঙ্গিচাতুরী দেখে কমলা ও ধরণীর সঙ্গে প্রভু উচ্চহাস্য করছেন। প্রভুর দর্শনে আমার এত আনন্দ হল যে, আমি তাকে আলিঙ্গন করতে ছুটলাম। কিন্তু প্রেমাতিশয্যে মূর্ছিত হয়ে আমি তাঁর সামনে পতিত হলাম। স্নেহপরায়ণ পার্ষদগণ আমাকে সুস্থ করালে আমি চোখ উন্মীলন করলাম। তারপর শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠনাথ করুণার্দ্র চিত্তে মৃদুগম্ভীর স্বরে আমাকে বললেন, 'বৎস, সুস্থ হও, এসো।' সেই কথা শোনামাত্র আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পাগলের মতো আমি নৃত্য করতে লাগলাম। শ্রীভগবান বলতে লাগলেন, 'বৎস, তোমাকে এই বৈকুণ্ঠে দেখার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম। হে সখা, তুমি বহু জন্ম কাটিয়েছ। তবুও আমার প্রতি কখনও অভিমুখী হওনি। হে ভাই, আমি আমার নামকীর্তন ইত্যাদি কোনরকম ছল পায়নি যে সেই ছলে তোমাকে এই বৈকুণ্ঠে নিয়ে আসব। আমার

প্রতি তোমার উপেক্ষা দেখে আমি ব্যগ্র ও অনুগ্রহকাতর হয়ে অনাদি ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার প্রিয়তম স্থান গোবর্ধনে তোমার জন্মগ্রহণ করালাম এবং আমি জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হলাম। আমার দীর্ঘদিনের অভিলাষ আজ তুমি সম্পূর্ণ করেছ। এখন আমার সুখবর্ধন করে তুমি স্থিরভাবে এখানে বাস কর।' আমি দেখলাম, সেখানে আমার সমবয়সী গোপবালক বেশধারী কিছু বেণুবাদক প্রভুর সামনে বেণু বাদন করছে। আমাকেও বেণু বাদনে প্রবর্তিত করলেন। তারপর যথাসময়ে পার্ষদগণ বহির্গত হলেন। মহালক্ষ্মীর আজ্ঞা অনুসারে পার্ষদগণ আমাকেও বাইরে আনলেন। কারণ প্রভুর ভোজনকালে সেখানে একমাত্র মহালক্ষ্মীরই অবস্থান করার অধিকার আছে। অনুপম মহা আশ্চর্যতম বৈকুণ্ঠধাম ও বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভু। আশ্চর্য তাঁর কৃপা। আমি তাঁকে চামর ব্যজন করতে লাগলাম। আবার কখনো বংশী বাজাতে লাগলাম এবং আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতজনিত মহানন্দ ভোগ করলাম।

কিন্তু আমার সেই পূর্ব অভ্যাস আমি ছাড়তে পারিনি। পূর্ব অভ্যাসবশে 'হে কৃষ্ণ, হে গোপাল' বলে নানা ভঙ্গি সহকারে স্তোত্র গাইতে লাগলাম। সেই স্তোত্র শুনে সেবকেরা একজন বললেন 'তুমি কি সব গাইছ! প্রভুর সাক্ষাতে বাল্যলীলা ঘটিত নগণ্য বিষয় কীর্তন করো না, বৈকুণ্ঠে এসব গেয়ো না।' সেকথা শুনে আমার বড়ই লজ্জা হল। কিন্তু অন্য একজন বললেন, 'যে স্তোত্র শুনে প্রভু সন্তুষ্ট হন, সেটি গাওয়া কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রভু ভালোবাসেন, অতএব গাওয়া ভালো।' সেকথা শুনে আমি প্রসন্ন হলাম। তবু আমার মনটি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য দিকে আকৃষ্ট হল না। বৈকুণ্ঠনাথ আমার মনোগত ভাব জেনে নন্দনন্দন কৃষ্ণরূপ হলেন এবং লক্ষ্মীদেবী রাধিকারূপ হলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ এবং অন্যান্য পার্ষদগণ ব্রজবালকরূপ ধারণ করলেন। আবার লীলাবশত তাঁরা উপবনে গোচারণ অনুষ্ঠান করলেন। সমস্ত কিছুই ব্রজধামের মতোই ছিল। বৈকুণ্ঠনাথকে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ রূপেই দর্শন করলাম। কিন্তু তবু আমার

মন তৃপ্ত হল না। বৈকুণ্ঠনাথকে আমার প্রিয়সখা জ্ঞান না করে পরমেশ্বর জ্ঞান হত। আমার কেবল মনে হতে লাগল, পরম দুর্লভ এই বৈকুণ্ঠে আমি এসেছি। সেই স্মৃতিবশে আমার প্রেমের হানি হত। ধ্যানস্থ হয়ে কৃষ্ণের চিন্তা করতাম, কখনো বা প্রভু বৈকুণ্ঠনাথ এবং গরুড় আদি পার্ষদ কোনও নিভৃত স্থানে চলে যেতেন, তাঁর অদর্শনে বৈকুণ্ঠবাসীর শোক উপস্থিত হত। অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেউ সুস্পষ্ট উত্তর দিতেন না। নিমেষের মধ্যেই প্রভু আবার ফিরে আসতেন। তাঁর দর্শনের অভাব অনুভব করতে অবকাশ দিতেন না। পরে পরে বুঝলাম ব্রহ্মাণ্ডের কোন সৃষ্টি-প্রলয় সংক্রান্ত কাল অতিবাহিত হয়ে চলেছে—যেটি আমাদের কাছে বৈকুণ্ঠে এক নিমেষের ব্যাপার।

বৈকুণ্ঠের সবকিছুই আনন্দময়। আমারও হর্ষ হত। কিন্তু কখনও কখনও বৃন্দাবনের কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে মন অবসন্ন হত। একসময় নির্জনে শ্রীনারদমুনির সাথে সাক্ষাৎ হল। মনের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, 'তুমি জগদীশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তিসাধন করে এই বৈকুণ্ঠে এসেছ। ভগবানের প্রতি প্রিয়তম বুদ্ধিতে প্রেম সম্পদ লাভ হয়। সেই মহাগোপ্য বস্তু গোলোকে রয়েছে। বৈকুণ্ঠের গবাদি পশু, পায়রা-কোকিল প্রভৃতি পাখি, মন্দার-কুন্দ প্রভৃতি বৃক্ষলতা, এমনকি কীটপতঙ্গ যা কিছু দেখছ—এই সকলই শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। এরা সবাই সচ্চিদানন্দ রূপ।'

তারপর নারদমুনি বিভিন্ন ভাবের ভক্তের সর্বোৎকৃষ্ট সুখাদির বর্ণনা করে আমাকে বৈকুণ্ঠের অল্প দূরে অযোধ্যা ধাম দেখালেন এবং বললেন, অযোধ্যা হয়ে মথুরা ধামে এবং তারপর দ্বারকাতে গমন কর। নারদমুনির কৃপায় অযোধ্যায় এসে পৌঁছলাম। তিনি বলেছিলেন, 'শিবের কৃপাগুণে যেমন বৈকুণ্ঠে এসেছিলে তেমনি রামচন্দ্রের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের ধামে যাওয়া যাবে এবং এই বিষয়ে বৈকুণ্ঠপতির অনুজ্ঞা গ্রহণের অপেক্ষাও নেই। কেননা বৈকুণ্ঠপতির আজ্ঞা অনুসারে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে এই সমস্ত কথা বলছি।'

আমি অযোধ্যায় গেলাম। সেখানে চঞ্চল বানরেরা লম্ফ ঝম্প দিয়ে 'জয় রাম জয় রাম' বলে শব্দ করছে। তাদের কাছে যেতেই তারা আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিল। কেননা সেখানে কারও হাতে বাঁশী নেই। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি রামপার্ষদ এবং মনোহর মনুষ্যরূপ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভরত, শত্রুঘ্ন সঙ্গে সুখে বসে আছেন। ভরতকে দেখেই আমি শ্রীরামচন্দ্র মনে করলাম। তাঁকে 'জয় মহারাজাধিরাজ, শ্রীরাঘবেন্দ্র, জানকীবল্লভ' বলে স্তব করতে লাগলাম। অমনি তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে নিষেধ করে বললেন, 'আমি হচ্ছি দাস।' অখিল মাধুরীময় প্রাসাদমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে সিংহাসনে বিরাজ করতে দেখলাম। বৈকুণ্ঠনাথের মতো তাঁর রূপবৈভব। কোন কোন অংশে বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষা তাঁকে আরও অধিক মনোহর মনে হল। তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর দর্শনে মোহিত হয়ে মূর্ছিত হলাম। পার্ষদদের যত্নে উঠে দেখলাম প্রভু রামচন্দ্রের বামে সীতাদেবী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, সামনে হনুমান। অন্য কেউ প্রভুর গুণগান করছে, স্তোত্র গাইছে, কেউ চরণ সম্বাহন করছে, কেউ মাথার উপরে ছত্র ধারণ করে আছে। আমি বার বার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করতে লাগলাম। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বললেন, 'তুমি প্রণামজনিত দুঃখ ভোগ করো না, বিশ্রাম করো, তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত হয়েছি, তুমি আমার বন্ধু, তাই তুমি সম্ভ্রম ত্যাগ কর।' সপার্ষদ রামচন্দ্রের আদরযত্নে আমি অভিভূত হলাম। কিন্তু তবু আমার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন ও খেলাধুলার কথা স্মরণ হতে লাগল। তাই এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আলিঙ্গন চুম্বনাদি কৃপাও লাভ করিনি। আমার মনোভাব জেনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি সুখে দ্বারাবতী গমন কর।

তারপর দ্বারকায় এসে আমার এমন মনে হল যে, এরকম মাধুরী বৈকুণ্ঠের কোথাও দেখিনি। সেখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে খেলায় রত যাদবদের দেখলাম। আমার এত আনন্দ হল যে, প্রণাম-স্তব-স্তুতি এসব করতেই ভুলে গেলাম। তবুও তাঁরা আমাকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করতে

লাগলেন। তারপর আমাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম সুধর্মা সভামধ্যে মণিস্বর্ণময় বরাসন তুলিকায় ভগবান বিরাজ করছেন। বৈকুণ্ঠপতির সাদৃশ্য হলেও দ্বারকাপতির অনেক অনেক অধিক শোভামাধুর্য লক্ষ্য করলাম। পারিজাত ফুলময় উদ্যান, নৃত্যগীত, রথাদি মহাবৈভবরাশি চতুর্দিকে প্রকাশিত। ভগবানের দক্ষিণে উৎকৃষ্ট আসনে শ্রীবসুদেব, বলরাম, অক্রূর প্রমুখ মহাজন উপবিষ্ট আছেন। বামে রাজা উগ্রসেন, গদ, সাত্যকি, সেনাপতি কৃতবর্মা ও ভোজ অন্ধক প্রভৃতি বৃষ্ণি প্রবরগণ রয়েছেন। শ্রীনারদ তাঁর বীণা বাজিয়ে গান করে প্রভুকে আনন্দ দান করছেন। সামনের দিকে বসে গরুড়দেব প্রভুর স্তব করছেন! উদ্ধব ভগবানের পাদ সম্বাহন করছেন। সেই উদ্ধব গোকুল-সম্বন্ধীয় বার্তা জানিয়ে প্রভুর চিত্ত বিনোদন করছেন। সেই সভাতে কেউ গোকুল রহস্য জানতে পারেননি। কেবলমাত্র ভগবানই গোকুল রহস্য শুনছেন। বৃহস্পতিশিষ্য উদ্ধব এমন কুশলে বাক্‌বিন্যাস করতেন যে অন্যে তাঁহার বাক্যমর্ম গ্রহণ করতে পারতেন না। গোকুলে আমার জন্ম জেনে উদ্ধব আমাকে প্রভুর পাদপদ্মের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রভুকে প্রণাম করতেই প্রভু তাঁর শ্রীহস্ত আমার গায়ে বুলালেন। এমন অনুগ্রহ আমি অন্য কোথাও অনুভব করিনি। ভগবান আমাকে নিয়ে বলরাম ও উদ্ধব সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে মা দেবকী ও রোহিণীদেবীকে দেখলাম এবং ষোল হাজার একশত আট রাণীকে নিজ নিজ পরিচারিকা সমেত পতির অভ্যর্থনার্থ অভিমুখে এগিয়ে আসতে দেখলাম। প্রদ্যুম্ন প্রমুখ কুমারদের দ্বারা শোভিত হয়ে প্রভু নিজ প্রাসাদমধ্যে উত্তম আসনে বসলেন। তখন আমি দেখলাম ভগবান বংশীধারী রাখালের মতো, দেবকী মা যশোদার মতো, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কুমারেরা গোপবালকদের মতো রূপ ধারণ করেছেন। ভগবান আমার হাতের বেণু নিয়ে বাজাচ্ছেন। গোকুলের ভাব স্মরণ করে তিনি এত বিহ্বল হয়েছেন যে, ভোজনকাল সমাগত হলে ভোজন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তবুও মায়ের অনুরোধে ভোজন করতে গেলেন। আগে নিজ

হাতে আমাকে ভোজন করালেন। তারপর তিনি কিঞ্চিৎ ভোজন করলেন। তারপর আমি উদ্ধবের গৃহে বাস করলাম।

যাদবেরা লক্ষ্য করলেন যে, আমি স্বচ্ছন্দে বিহার করছি না। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'বৈকুণ্ঠ থেকেও পরম ঐশ্বর্যযুক্ত এই দ্বারকাপুরীতে এসে কিজন্য তুমি এত দুঃখিত হয়েছ। এখানে ইচ্ছামাত্রেই স্বতঃই ভোগসামগ্রী উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি কেন অকিঞ্চনের মতো রয়েছ।' প্রভু দ্বারকাধীশ কখনও পাণ্ডবদের দর্শনে যেতেন, তখন আমার মন ব্যথিত হত। প্রভুর অদর্শনে তাঁর রূপ-গুণ স্মরণ করেই ব্যথা তিরোহিত হত।

একদিন শ্রীনারদমুনিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে মুনিবর। স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে যেরকম আপনাকে দেখতাম, এখনও দেখছি, আপনি কি সর্বত্র আছেন!' শ্রীনারদ আমাকে বললেন, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হয়েও বহু স্থানে বহু মূর্তিতে প্রকাশমান হয়ে থাকেন, তেমনি তাঁর সেবকেরা আমরাও বহু স্থানে বহু মূর্তিতে অবস্থান করে থাকি। আমরা সবাই তাঁর পার্ষদ এবং সর্বদা তাঁর ভজনে তৎপর। তিনি যেমন খেলা করেন আমরাও সেই অনুসারে তাঁর অনুরূপ হয়ে থাকি।' এই বলে নারদমুনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই দ্বারকাতে রয়েছ, অথচ তোমাকে দেখতে এত অতৃপ্ত দুঃখী কেন?' উদ্ধবকে তিনি বললেন, আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে। উদ্ধব বললেন, 'আমি জাতি-স্বভাবে ক্ষত্রিয়। ভক্তিমার্গের গুরু আপনি এর সমাধানের উপযুক্ত পাত্র।' শ্রীনারদ বললেন, 'ভৌম দ্বারকায় জাতির বিচার থাকতে পারে। কিন্তু এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকায় কেন তোমার ক্ষত্রিয় বুদ্ধি!' উদ্ধব বললেন, 'আমাদের প্রভুরও ক্ষত্রিয় অভিমান প্রবল। সৎ ধর্ম পালন, গৃহস্থ নিয়ম পালন, শত্রু জয় স্পৃহা, ব্রাহ্মণ সম্মাননা, ব্রাহ্ম মুহূর্তে উত্থান প্রভৃতি এসব ছাড়তে পারেননি। মর্ত্যেও যেমন, এখানেও তেমন।' নারদমুনি আমাকে বললেন, 'হে গোপালপ্রিয়! এই দেখো, দূরে গোলোক নামক স্থান। সেখানেই তোমার সমস্ত দুঃখ মিটবে। শ্রীবৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ পরম মাধুর্যময় ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে সর্বারাধ্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

এবং তাঁর সমস্ত পরিকরবৃন্দ রয়েছেন। কখনও কখনও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুরূপে গৌররূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গোলোকের প্রেমরত্নস্বরূপ তন্নাম মহামন্ত্র পৃথিবীতে প্রচার করেন। পৃথিবীর সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিরা সেই রত্ন গ্রহণ করে থাকে। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রীতির আকর্ষণে সরাসরি গোলোকে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবৎ কৃপা লাভ করে থাকে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ লোকের বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতির সংক্ষিপ্ত সাধারণ ধারণা

শ্রীগোলোক বৃন্দাবন
↑
দ্বারকা
↑
অযোধ্যা
↑
বৈকুণ্ঠ
↑
শিবধাম
↑
ব্রহ্মজ্যোতির্ময় স্থান
↑
ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত মহাআবরণ
↑
সত্যলোক
↑
তপোলোক
↑
জনলোক
↑
মহর্লোক
↑
স্বর্গলোক
↑
ভুবর্লোক
↑
ভূলোক (পৃথিবী)
↓
অতল
↓
বিতল
↓
সুতল
↓
তলাতল
↓
মহাতল
↓
রসাতল
↓
পাতাল
↓
ব্রহ্মাণ্ডের পরিসীমা
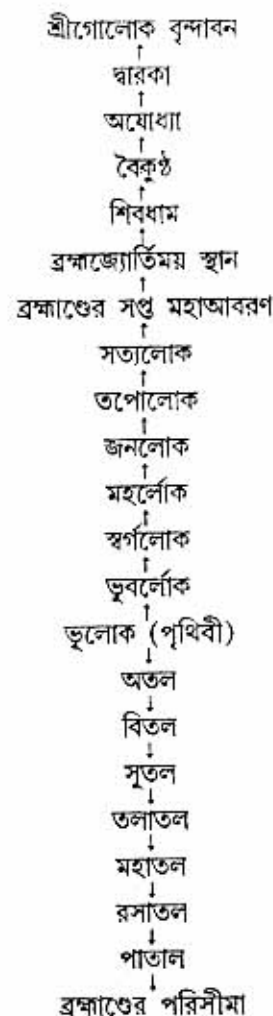
বহু জনমের পরে
হরি ভজিবার তরে
পৃথিবীতে আসি জীব
মনুষ্য-আকার ধরে।
যেই হতভাগা লোক
নাহি লয় সে-সুযোগ
নিত্য দুঃখ-কষ্টে মরে
বহু কল্প-কল্পান্তরে ॥